KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৮ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কল-১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 8/3 Award Issue 9/2 9/4	Year of Publication : Aug 1985 Oct 1985 May 1986 Aug 1986 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

বিভাব

২৭

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিভাব

Medium & Large Scale Entrepreneurs :

Do you have any intention to set up industries at

SILIGURI & ULUBERIA !

We are waiting for you with land with basic industrial infra-structure facilities. It is our another endeavour after establishing industrial growth centres at Haldia, Kharagpur & Kalyani.

Please, call on us conveniently.

West Bengal Industrial Infrastructure Development Corporation

P-34, C. I. T. Road (2, 3, & 4 Floors)

Calcutta-700 014

Phone No. : 24-8684, 8525, 8096

Kesoram Industries

&

Cotton Mills Limited

9/1, R. N. MUKHERJEE ROAD, CALCUTTA-700 001

Manufacturers of Cotton Textiles & Piece Goods, Rayon Yarn, Transparent Cellulose-Film, Sulphuric Acid, Carbon-di-Sulphide, Cast Iron Spun Pipes and Fittings, Cement, Refractories etc.

Sections :	*Mills :*
Textile Section	42, Garden Reach Road, Calcutta.
Rayon G. T. P. Section	Tribeni, Dist. Hooghly.
Spun Pipe Section	Bansberia, Dist. Hooghly.
Cement Section	Basantnagar, Dist. Karimnagar (A.P.)
Refractory Section	Kulti, Dist. Burdwan.

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র • কলিকাতা-৭০০ ০০৯ •

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষা ১৩৯২

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

আঁধার রাতে একলা পাগল····· ॥ শর্মিলা বসু

অমিতেশের মৃত্যু ॥ শুভ বসু

বিশেষ ক্রোড়পত্র নাটক

কষ্টি-পাথর : রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৯

একটি অনালোচিত নাটক : কষ্টি-পাথর ॥ রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ৬২

প্রবন্ধ

ডিরোজিওগুরু ডেভিড ড্রামণ্ড ॥ সুবীর রায়চৌধুরী ৯

আলোচনা

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচে : সংবাদপত্র না সংবাদ ॥ মানসী দাশগুপ্ত ৩৩

গল্প

কর্ণেল রাজার কবর ॥ অশেষ চট্টোপাধ্যায় ৪০

শিল্পভাবনা

রবীন্দ্রনাট্যচর্চায় অন্তর্মুখ ॥ তপন সরকার ৬৮

সম্পাদকমণ্ডলী
পবিত্র সরকার
দেবীপ্রসাদ মজুমদার প্রদীপ দাশগুপ্ত
শুভকুমার বসু

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলকাতা ১৭

সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : অনুপ রায়
অলংকরণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস কলকাতা-১৭ থেকে
প্রকাশিত এবং সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

বয়স সবে কুড়ি ছুঁয়েছিল। উজ্জ্বল, বিস্তৃতআঁখি, সুপুরুষ নাট্যপ্রাণ সদ্যউত্তীর্ণ-কৈশোর শুভ বসু স্বেচ্ছায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। আকস্মিক কোনো আঘাতে মানুষ যদি তার কোনো প্রিয় প্রত্যঙ্গকে বিচ্ছিন্ন হ'তে দেখে, তবে কোন্ ভাষায় সে শোক প্রকাশ করবে? শুভ বসু সম্পর্কে আমাদের শোকপ্রকাশের কোনো অক্ষর নেই। ভাষা আর কতদূর আমাদের নিয়ে যেতে পারে।

ক' বছর আগে স্বেচ্ছায় এসে 'বিভাবে'র দায়িত্ব নিয়েছিল। কি সম্পাদনা সহযোগিতায়, কি প্রেস ও তার প্রাসঙ্গিক পরিশ্রমে—মূলত শুভর সম্পূর্ণ একার প্রচেষ্টায় 'বিভাব' মোটামুটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল গত কয়েক বছর। সম্পাদনায় তার অন্তর্দৃষ্টি ছিল বিস্ময়কর। একথা বলতে দ্বিধা নেই শুভ উত্তরকালে একজন অতি দক্ষ সম্পাদক হ'য়ে উঠতে পারতো। হয়তো তার চেয়েও বড় ছিল তার অভিনয় প্রতিভা, সেখানেও বাঙালী একজন অতি দক্ষ সম্ভাবনাময় নটকে হারালো। সম্পাদকীয় সংযোজনায় শর্মিলা বসুর লেখাটি আমাদের আত্মসংবরণ করে পড়তে হবে। অশ্রু নয়, চাই শুভর জন্য প্রার্থনা।

আমাদের পরমপ্রিয় কবি বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও আর আমাদের মধ্যে নেই। এই স্পষ্টবাক নির্ভিক মানবদরদী এই কবি আমাদের প্রত্যেকেরই আভূমিনত শ্রদ্ধার মানুষ ছিলেন। বিভাবের এই সংখ্যা তাঁকেই উৎসর্গ করা হ'লো।

কবি অরুণ ভট্টাচার্যও পরলোকগমন করেছেন। কবিতা রচনা ছাড়াও 'উত্তরসূরী' সম্পাদনায়, সঙ্গীতগবেষণায়, তিনি যে নিরিখ রেখে গেছেন, তা প্রতিটি সংস্কৃতমনা বাঙালীর স্মৃতিতে অমলিন থাকবে।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদকীয় সংযোজনা

আঁধার রাতে একলা পাগল……

জীবন তার সহজ চলার ছন্দে যেমন স্বাভাবিকতাকে রক্ষা ক'রে যায়, মৃত্যুও তেমনই এক অমোঘ কৌশল—যার মায়ায়, আহ্বানে সাড়া না দিলে জীবনের স্বচ্ছন্দ চলাটাই বুঝি নষ্ট হয়ে যায়। মৃত্যুকে কেউ ভয় পায়, কেউ ভালোবাসে। যারা ভালোবাসে তারা মৃত্যুকেই ভাবে জীবনের আরেক উত্তরণ, এক নিবিড় কালো অমাপ্রতিম নিশ্ছিদ্র শান্তি—জীবন থেকে বৃহত্তর জীবনযাত্রার সোপান। এই যাওয়া যাওয়া নয়—এ ঘুম ঘুম নয়; এ ভালোবাসা—তাই অমল ঘুমিয়ে পড়লেও পৃথিবীর ভালোবাসা তার কানে কানে বলে যায়—'সুধা তাকে ভোলে নি'।

ভালোবেসে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিলো আমাদের সবার অসীম স্নেহের মানুষ শুভকুমার বসু। গত ১৪ই আগষ্ট রাত্তিরে যখন স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সারাদিনের কর্মক্লান্ত মানুষেরা বাড়ি ফেরার কথা ভাবছিলো, বা বাড়ি ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে দিচ্ছিলো শ্রান্তিতে, তখন জীবনের প্রতি নিদারুণ ভালোবাসায় অথচ গভীর ক্লান্তিতে মৃত্যুর শয্যায় গা পেতে দিলো শুভ—মাত্র উনিশ বছরের এক তরুণ।

কে ভেবেছিলো দুর্দম প্রাণবান এই সদ্য তারুণ্যে-উত্তীর্ণ ছেলেটির মধ্যে এতো জিজ্ঞাসা, এতো অস্বস্তি, এতো দ্বিধা লুকিয়েছিল। তার সব প্রশ্ন, সব সমস্যার একটাই উৎস ছিলো সম্ভবত—তা হ'লো জীবন এবং জীবনেরই পরিপার্শ্বসংক্রান্ত। সচ্ছল ঘরের সন্তান, মেধাবী, সর্বজনপ্রিয় ছেলেটির জীবনে আপাত প্রাপ্তির অভাব ছিলো না। তাই হয়তো রবীন্দ্রনাথের তারাপদ-র মতোই সবার ভালোবাসার জন এই তরুণ আরো বড়ো এক মুক্তিভাবনায় ভেতরে ভেতরে প্রাণিত হচ্ছিলো। জীবনের সুখসংক্রান্ত ছকবাঁধা ধারণার বাইরে জীবনের আনন্দকে, তাৎপর্যকে আলাদা ক'রে দেখতে চেয়েছিলো সে। আর সেই প্রকৃত জীবনায়নের অর্থকে বোঝার জন্যই জীবন উৎসর্গ ক'রলো এই তরুণটি।

আবাল্য এক সৃষ্টির প্রেরণায় সে ছিলো অস্থির। মাত্র তেরো/চোদ্দ বছর বয়সে নিজের সম্পাদনায় বার করেছিলো 'চেনামুখ' নামের এক কাগজ। ওই বয়সেই সে ভেবেছিলো নিজেদের কথাকে খোলাখুলি বলার একটি মাধ্যমের কথা। তথাকথিত শিশুসাহিত্যভাবনার বিরোধী চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে সে বলেছিলো তার সম্পাদকীয় ভাষণে—"…কোন ভাল লেখাকে ছোটদের বা বড়দের বলে ভাগ

করা যায় না। ছোটরা সব লেখাই পড়বে, না বুঝতে পারলে লেখাটা নিয়ে ভাববে সে তার উপযোগী ক'রে। আবার পড়বে আবার ভাববে…এবং একসময় আসল মানে বুঝতে পারবে। এই কারণেই আমরা এমন সব লেখা প্রকাশের চেষ্টা করছি যা শুধু ছোট বড় সবার ভাল তো লাগবেই তাঁদের ভাবাবেও। …আমাদের পত্রিকা ছোট বা বড় কারুরই নয়, সবার।" তার পত্রিকায় একদিকে যেমন লিখেছেন শঙ্খ ঘোষ, পবিত্র সরকার, নবনীতা দেবসেন, উজ্জ্বল মজুমদার, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাল দাশগুপ্ত, সুরেশচন্দ্র মৈত্র-র মতো বিদগ্ধজনেরা, তারই পাশাপাশি বহু নবীনদের লেখাও স্থান পেয়েছে। এমন কী, অনেক ভাবীকালের কবি, প্রাবন্ধিকের লেখার প্রথম মুদ্রণের কৃতিত্বও হয়তো শুভকুমারেরই দাবি হবে এক সময়ে।

বছর আড়াই আগে নিজের পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা বাতিল ক'রে শুভ যোগ দেয় 'বিভাব' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর কনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে। তারই অক্লান্ত উদ্যমে 'বিভাব' ত্রৈমাসিকতায় নিয়মনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পত্রিকা প্রকাশের খুঁটিনাটি তদারকিতে সে-ই ছিলো সবচেয়ে তৎপর ও সক্রিয়। দূরভাষে বা সরাসরি হাজির হয়ে লেখকদের কাছ থেকে লেখা আদায় করায় তার জুড়ি ছিলো না। আসলে সবই ছিলো তার প্রাণশক্তির অফুরাণ প্রকাশ।

সম্পাদক শুভ প্রায়শই বলতো, 'সম্পাদনা করলে লেখালেখিটা বন্ধ হয়ে যায়'। কিন্তু তার এই মন্তব্যের সবচেয়ে বড়ো পরিপন্থী তারই কর্মধারা। শুভ কবিতা লিখেছে—সে-সব কবিতা প্রকাশও হয়েছে কিছু কিছু পত্রিকায়। শুভ গল্পও লিখেছে। তার লেখার মূল্যায়ন করার সময় বা পরিণতি কোনোটাই যদিও উপস্থিত নয়, হওয়া সম্ভবও নয়—তবুও তার বিচিত্র আত্মপ্রসারের প্রয়াস প্রশংসাধন্যতার দাবিদার।

শুভ-র সবচেয়ে বড়ো ভালোবাসার জায়গা ইদানীং হয়ে উঠেছিলো তার দল 'অন্তর্মুখ' এবং তার নাট্যপ্রয়োগগুলি। রবীন্দ্ররচনাকে ঘিরেই তার যাত্রা মূলত। তবে বুদ্ধদেব বসু-র 'প্রথম পার্থ'ও ছিলো তার প্রিয় নাটক! সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবেই আমরা প্রায়শ দেখে থাকি। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যকে একাত্ম করে নেওয়ায় যে সাহিত্যিক সিদ্ধি লুকিয়ে আছে তার সঙ্গে কারুর কারুর বিরল পরিচয় ঘটে। শুভ ছিলো সেই ঋত্বিৎদের দলে। রবীন্দ্রনাথের কিশোর ও তরুণ চরিত্রগুলি কিংবা কর্ণের মতো 'বঞ্চিত যে ছেলে'—তারা শুভকে বিভাবিত করেছে, উদ্দীপিত করেছে, জীবনবৃন্তে এদের সাহিত্যিক চেহারাগুলোকে সে অনুভূতির সিঞ্চনে ক'রে তুলতে চেয়েছে বিকচমান। তারুণ্যের আত্মোৎসর্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর

সাহিত্য-আত্মার উত্তরণের পথ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, শুভ-ও একই ভাবনায় বৃত হয়ে এর মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলো 'অমর্ত্য' বিভা'-র নিশানা।

রবীন্দ্রনাথ জীর্ণ পুরাতনের 'অচলায়তন'কে ভাঙার গান দিয়েছিলেন পঞ্চকের গলার ভৈরবীর সুরে—'আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা,/এ পথে সেই গোপন কথা/কেউ তো আনে না/তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না।' কিশোর পঞ্চকের মধ্যেই আচার্য দেখেছিলেন—"তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখতে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম মানুষের মন শাস্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতি প্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' থেকে রবীন্দ্ররচনায় বাল্য-কৈশোর-তারুণ্যের বিকাশে জড় অহং আর জরাগ্রস্ত আচারসর্বস্ব প্রথাপ্রিয়তার অবসান দেখানো হয়েছে—এদেরই মৃত্যু পরিপার্শ্বের অহংময় গ্লানির অন্ধকারকে কাটিয়ে উঠতে পৌনঃপুনিক আবর্তনে স্থান পেয়েছে। 'বিসর্জন'-এর জয়সিংহ, 'শ্যামা'র উত্তীয়, 'ঘরে বাইরে'র অমূল্য, 'মুক্তধারা'র অভিজিৎ, 'রক্তকরবী'র কিশোর—এদের মধ্যে শুভ দেখেছিলো জীবন দেওয়ার মধ্যেই জীবনের অমর্ত্য বিভা। এদের অনুভবগত অকৃত্রিমতা, ভালোবাসার নির্ভেজাল বিকিরণ এদেরই প্রায় সমবয়সী শুভকে ভেতরে ভেতরে আচ্ছন্ন ক'রে রাখতো। চারপাশের স্বার্থসন্ধিৎসুতা আর আত্মকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠামুখিনতা যখন ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মতো সুস্থ সমাজ পরিবেশকে কুরে কুরে খেয়ে দূষিত করে দিচ্ছে তখন সেই অসুস্থতার প্রতি অস্বস্তিতে অথবা আক্রোশে শুভ প্রাণ দিলো। মৃত্যুর আগের দিন এক অন্তরঙ্গ আলাপচারিতে বলেছিলো—'চারিদিকের বুদ্ধিজীবীদের ব্যবসায়িক চেহারা দেখে ঘেন্না হয়'। জয়সিংহ বোধহয় এমনই বিভ্রান্ত হয়েছিলো গুরু, পিতোপম রঘুপতির কাপট্যে। কে জানে, নিজের প্রাণ দিয়ে শুভ-রও ঈপ্সিত ছিলো কিনা জীবনের কোনো মুক্তধারাকে খুলে দেবার। অভিজিতের মতোই সে-ও হয়তো জানতো 'যেখান থেকে ডাক এসেছে সেইখান থেকে আলোও আসবে'। অথবা কোন্ স্বর্ণলোভী যক্ষপুরীর রাজার বিরুদ্ধে ছিলো তার সংগ্রাম—ক্ষমতা যেখানে যৌবনকে মারতে চায় সেই মারণের মুখ থেকে ভালোবাসাকে নিজের বুকের রক্তে রাঙিয়ে রক্তকরবী দিয়ে সাজানোই ছিলো তার অন্তিমব্রত। চারিদিকের মুখোশ-আঁটা ভড়ংবাদীদের ভিড়ে 'জীবনের মূলে যে কলঙ্ক লেগেছে' তারই মোচনে সে নিতে চেয়েছিলো পাঠকের ভূমিকা। তার আক্রমণ তথাকথিত সুধী, প্রতিষ্ঠামেড়ুর মানুষদের প্রতি—তার সহজতার ইচ্ছা সহজচালের জীবনযাপনের

টানে। সমাজ-প্রতিবেশের চাপে হাঁপিয়ে উঠছিলো তার তরুণহৃদয়ের অনাবিল মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা। শুভ-র প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিলো 'আঁধার রাতে একলা পাগল…।' সমস্ত পরিপার্শ্বের প্রতি তার আর্তি ছিলো মূল শেকড়টাকে বোঝার—'বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে'।

শুভ মৃত্যুকে বেছে নিয়েছে স্বেচ্ছায়। তাই তার মৃত্যুর জন্যে আপাতত দায় নেই কারুর। কিন্তু তার মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে আমরা সবাই-ই দায়ী। আমাদের পরিণতমনের লোভ, প্রতিযোগিতাকামিতা, স্বার্থান্ধতা, জীবনের হাটে মুখ আর প্রতিষ্ঠার মূল্যে বিকিয়ে-যাওয়া অসুস্থ, বিকৃত চেহারা শুভ-র মতো সংবেদনশীল তরুণকে বিদ্ধ করেছে, বিভ্রান্ত করেছে, ভাবিয়েছে, আহত ক'রে প্রতি মুহূর্তে ভেতরে ভেতরে রক্তক্ষরণে মুমূর্ষু ক'রে তুলেছে। শুভ-র মৃত্যু আমাদের সেই অচলায়তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের কাছে আমাদের অঙ্গীকার তাই হবে সুস্থ, সপ্রাণ সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্যে।

অমিতেশের মৃত্যু

শুভ বসু

অমিতেশের মৃত্যু ১

ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিক ঢাকুরিয়া ব্রীজটার নিচেতে। একটা ডবলডেকার বাসের তীব্র কর্কশ ব্রেকটানার শব্দ। একটা যুবকের আর্তনাদের শব্দ গেঙোনীতে ভরে গেল, অবশেষে স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত আওয়াজ। আশেপাশের লোকেরা ছুটে এল কারুর বমি-বমি পেল থেতলে যাওয়া শবটার দিকে তাকিয়ে। কেউ কেউ বমি করলও। কেউবা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। অমিতেশের শরীরটা দেখলে মনে হয় lunch এর জন্য বাবুর্চী মুর্গি ছাড়িয়েছে। অমিতেশের হাড়, চর্বি, মাংস, রক্ত সমস্ত মিলে একটা পিণ্ড তৈরী হয়েছে। মনে হচ্ছে কোন দৈত্য অমিতেশকে বল তৈরী করে খেলেছে। একটা মুহূর্তও নয় তার আগেই শেষ হয়ে গেল একটা প্রাণ, একটা জীবন, যেন একটা ইতিহাসের পাতা। দুটো লোক ধরাধরি করে অমিতেশের মৃতদেহটা—না মৃতদেহ কথাটা এখানে প্রযোজ্য নয় লাল থেকে ক্রমশঃ বেগুনি হয়ে যাওয়া বস্তুটিকে ট্যাক্সিতে তুলল। ওরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে বলে।

অমিতেশের মৃত্যু ২

অমিতেশ আজ মানুষ থেকে বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এরপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। সেই অভিশপ্ত ঘটনাটার কথা কারুরই মনে নেই। অমিতেশের মা বাবা কেউই আজ বেঁচে নেই। আসল কথা অমিতেশের মৃত্যুতে পৃথিবীর বা মানুষের কারুরই কিছু এসে যায়নি। কারণ—অমিতেশের মৃত্যুর মুহূর্তটাতে মৌলালীতে দাঁড়ানো পুলিশটা নিয়মভঙ্গকারী গাড়িটার নম্বর টুকেছে, কথামত সিনেমা দেখার জন্য Elite-এর সামনে পাঁচ বন্ধুর দেখা হয়েছে, ঠাণ্ডা খাবার দেবার জন্য বাড়ির বাবু চাকরকে ধমকেছে। অমিতেশের মৃত্যুর ফলে কোন বিপ্লব ঘটেনি। এমনকি অমিতেশের সেই প্রেমিকাটি যে অমিতেশের মৃত্যুতে তিন দিন কেঁদেছিল, সে আজ তার স্বামীপুত্রকে নিয়ে ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে গেছে। যে দুটো লোক অমিতেশের মাংসপিণ্ডটাকে ট্যাক্সিতে তুলেছিল তাদের মধ্যে একজন বন্ধুদের সঙ্গে বসে তাস খেলছে, অন্যজন সিনেমা দেখতে গেছে। যে লোকটা অমিতেশকে দেখে বমি করেছিল সে এখন রেষ্টুরেণ্টে বসে কাটলেট খাচ্ছে। সত্যি, অমিতেশের মৃত্যুতে কারুর কিছু এসে যায়নি। এমনকি অমিতেশের মৃত্যুতে অমিতেশেরও কিছু এসে যায়নি, কারণ অমিতেশ তো মৃত। মৃত ব্যক্তির কিছুতে কি এসে যায়?

[তেরো বছর বয়সে রচিত]

বিভাব বিশেষ ক্রোড়পত্র
নাটক : কষ্টিপাথর

প্রস্তাবনা।

উদ্যান।

পুরুষ ও স্ত্রীগণ।

স্ত্রীগণ।—শুধু হাত পা ছোঁড়ায় কাজ হবে না
ওহে রসময় !
কর যা রয় সয়—
কেবল সদরে যা আঁটাআঁটি,
খিড়কিতে যে হাতীর ভয় !!

পুরুষগণ।—জয় ভারতের জয়, জয় আর্য্যবংশ জয়,
জয় জয় জয় বাঙ্গালীর জয় !!

স্ত্রীগণ।—হরু বলে "ভারত মাতা জাগ একবার।"
নরু বলে "জাগিবে কে, নাড়ী যে নেই তার,
ঘুম সোজাত নয়।"

পুরুষগণ।—জয় ভারতের জয়, জয় আর্য্যবংশ জয়,
জয় জয় জয় বাঙ্গালীর জয় ! !

স্ত্রীগণ।—হরু বলে "ধর্ম্মভেদে মারা গেল দেশ"
নরু বলে "ধর্ম্মভেদ নয়, ভেদ-বমিতেই শেষ,
বুক বিদীর্ণ হয়"

পুরুষগণ।—জয় ভারতের জয়, জয় আর্য্যবংশ জয়
জয় জয় জয় বাঙ্গালীর জয় ! !

স্ত্রীগণ।—হরু বলে "কোথা আজ সেই আর্য্যঋষিগণ"
নরু বলে "চীনেপাড়ায় কল্লেন পলায়ন,
বুঝে অসময়"

পুরুষগণ।—জয় ভারতের জয়, জয় আর্য্যবংশ জয়
জয় জয় জয় বাঙ্গালীর জয় ! !

স্ত্রীগণ।—হরু বলে "ভারতের তবে হবে না কি গতি"
নরু বলে "হতে পারে, গয়াতে যাও যদি
তল্পি বাঁধ মহাশয়!!"
পুরুষগণ।—জয় ভারতের জয়, জয় আর্য্যবংশ জয়
জয় জয় জয় বাঙ্গালীর জয়!!

———

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিষ্ণুবাবুর বৈঠকখানা।

বিষ্ণুবাবু, নবীনবাবু ও রামহরিবাবু

নবীন। তার চেয়ে সৌভাগ্য আর কিছু জানি না। এ হাড়কখানা দেশের জন্য যাবে, তা অপেক্ষা উচ্চ অভিলাষ আমার নাই। রামহরিবাবু! ইংরাজরাজ্য রামরাজ্য, জানি না রামরাজ্যেও এত সুখ ছিল কি না; এত আরাম, এত স্বাধীনতা, আর কোন রাজার আমলে প্রজারা পেয়েছিল কি? রাণী দীর্ঘজীবন লাভ করুন, প্রজার সচ্ছন্দতার জন্য, প্রজার রক্ষার জন্য, প্রজার উৎপীড়ন-নিবারণ জন্য, কি আইন না তিনি করেছেন বা কচ্চেন?

রামহরি। বিস্তর আইন। এবারকার B. L. Examine-এর question দেখলে পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে যায়। Vacation-এর আগে একটা Case আমায় conduct কত্তে হ'য়েছিল কেবল তার reference খুঁজতেই আমার দশবার দিন কেটে ছিল, তবে cost—

নবীন। যা বলছিলেম। বাপ-মা আমাদের মানুষ ক'রে দেন, আমরা তাঁদের যত্নে দাঁড়াতে শিখি, হাঁটতে শিখি, তাঁদের অন্ন খাই, তাঁদের বস্ত্র পরি, তবু হলে কি হবে, এতর ভেতরেও আমাদের আত্মনির্ভর অভ্যাস কত্তে হয়। তাঁরা হাঁটতে শেখান, আমরা নিজে সাবধানে না হাঁটলে হোঁচট খাই, পড়ে যাই, তাঁদের অন্ন আছে, না বুঝে খেলে আমাদের উদরপীড়া হয়। সেই রকম ইংরাজরাজ আমাদের সব দিয়েছেন, তবে আমাদের নিজেদের আত্মনির্ভর না থাকলে সমস্তই মিছে। তাই বলছিলাম, আমাদের আপনাদের মধ্যে ঐক্য-অবলম্বনে পরস্পর আত্মনির্ভর শেখা আবশ্যক। এই এত খপরের কাগজ, এত সভা সমিতি, এই যে Congress, এ সমস্তর অর্থই এক—উদ্দেশ্য একমুখী—সেই আত্মনির্ভর শিক্ষার প্রয়াস। জীবন উৎসর্গ কর ভাই, দেহ মন, প্রাণ, সব দেশের উপকারে নিয়োজিত কর, এ জাতীয় জীবনের শৈশবকালে পরস্পর বদ্ধ-পরিকর হয়ে চলিতে অভ্যাস কর—

বিষ্ণু। Mr. Mukerjee কাল এসেছিলেন, অনেক কথা হল, Congress-এর

British committee-র পুষ্টি প্রধানতঃ আবশ্যক, তার জন্য অর্থও বিশেষ প্রয়োজন, আর তার সঙ্গে রীতিমত co-operate কত্তে হলে এখানকার Congress meettings খুব regular হওয়া চাই, দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, Congress-এর উদ্দেশ্য জন-সাধারণকে বোঝান চাই, mass যতক্ষণ না বুঝবে Congress কি, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হওয়া সঙ্গত নয়, এরকম অনেকক্ষণ ধ'রে কথা হল। তিনি বলেন আমাদের উপর তাঁর ভরসা বেশী। Difference of opinion তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমাদের ঘটে বটে, কিন্তু দেশের এ অবস্থায় লোকটা যে খুব দরকারী তার আর সন্দেহ নাই।

রামহরি। তাত বটেই। খুব sensible। লিখিয়ে, পড়িয়ে, বলিয়ে। তাঁর সম্বন্ধী একটা মারপিটের caseএ আমাকে আবার retain করেছিলেন, আমাকে তিনদিন হুগলি courtএ attend কত্তে হয়েছিল, এখনও আমার সে account fear দরুন কিছু পাওনা আছে, তা যে আর দেন তা বোধ হয় না। তা না দিন। তাঁর ভগ্নীপতি অত বড় patriot, আমিও on the Score of patriotism সে টাকা ছেড়ে দেব মন করেছি।

(হারাণের প্রবেশ)

হারাণ। বাবু, যত দল নগর কীর্ত্তন কত্তে বার হয়েছিল সব ফিরেছে, কেবল পূর্ণচন্দ্রবাবু দল নিয়ে বরানগরে গিয়েছিলেন, তাঁদের সেখানকার লোকে বড় মারপিট করেছে।

বিষ্ণু। মেরেছে?

হারাণ। বড্ড মেরেছে বাবু! পূর্ণবাবুকে পাল্কীতে নে আসতে হয়েছে।

রামহরি। বরানগরে মেরেছে? তা হলেত শ্যালদার ফৌজদারীতে যেতে হয়।

হারাণ। কাপড় চোপড় রক্তে ডুবে গেছে।

রামহরি। Griveous hurt। আগে আমাদের Plaint file করা চাই, cross-caseত হবেই—ডেমি কাগজে—

বিষ্ণু। আচ্ছা আর একদল বরানগরে পাঠাও, মারে মারুক দেখি কত মারে, মার খেয়ে খেয়ে তাদের পরাস্ত কর, হারাণ এবার তুমি যাও।

হারাণ। আমাকে মাপ করুন মশায়! আমার শরীর ভাল না, মার আমার ভাল সয় না।

নবীন। যা বলছিলেম; দেশের জন্য জীবন পণ কর ভাই! আপন ভোল, পর ভোল, ঐশ্বর্য্য ভোল, বিলাস ভোল, ভোগ ভোল, রোগ ভোল। ভুলে যাও

ভাই তুমি গরীব, ভুলে যাও তুমি রাজপুত্র।

(গাঙ্গুলীর প্রবেশ)

গাঙ্গুলী। যা বলেছেন মশাই! রাজপুত্তুর! রাজপুত্তুর! কিযে গড়ন যেন ননীর চাপ থেকে কেটে তুলেছে। দিব্বি দোহারা, একটু পাশ থেকে গোলাপীর আভা মাচ্চে।

নবীন। বেশ, তাঁকে আন, তাঁর রূপ ভুলতে বল, বল কাদা মাখতে হবে, ছাই মাখতে হবে।

গাঙ্গুলী। আজ্ঞে, ছাই না মাখলে ত কোন কাজই হবে না। ছাই মাখতে ত তিনি প্রস্তুত, মশায়।

বিষ্ণু। কে গাঙ্গুলী, এত নরম প্রাণ কার?

গাঙ্গুলী। যাঁদের কথা বলছি মশায়! এক জোড়া নিয়ে এলুম যে। অমন ইলিস মাছ এ বছর দেখেন নি। এক টাকা নিয়েছে বটে, কিন্তু অমন মাছ এ বছর বাজারে আসেনি। একবার দেখবেন চলুন—রাজপুত্তুর, মশায় রাজপুত্তুর।

নবীন। ভাই! এ তুচ্ছ পার্থিব কথার সময় নয়। এখন পেট ভুলতে হবে, খাওয়া ভুলতে হবে, মাছ ভুলতে হবে।

গাঙ্গুলী। (হারাণের প্রতি জনান্তিকে) নবীনবাবু এখন আত্মার কথা পেড়েছেন বুঝি। খালিপেটে আত্মার কথার সুবিধে হবে কি? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আপনি বলতে থাকুন, আমি মাছ দুটোকে ঢাকাদে আসি। (প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ) দূর হোক্, আত্মার কাছে আবার অপরাধী হব, আপনি বলুন, ও শেষ করে যাওয়াই ভাল।

(রঙ্গিণী গুপ্তের প্রবেশ)

রঙ্গিণী। Good morning, Bistoo! Nobin Babu wellmet. তারপর morning tea-র ওপর একটি gossip চলছে, অ্যাঁ!

নবীন। আসুন, ভারতের ভবিষ্যত আশার ধ্রুব নক্ষত্র, আসুন। আপনার মত উজ্জ্বল তারকায় যে দিন ভারত আকাশ প্লাবিত হবে, যে দিন ভারত প্রান্তর আপনাদের স্নিগ্ধ রশ্মিতে স্নাত হয়ে পরম রমণীয় কান্তি ধারণ করে নয়ন শীতল করবে—

(হরের প্রবেশ)

হরে। বড় বাবু! বড় বাবু! শিগ্‌গির বাড়ী আসুন। ছোট দিদি বাবু, সকালে বেড়াতে গে ঘোঁড়া থেকে পড়ে গেছেন। কোমরের হাড় একেবারে ভেঙ্গে

গেছে, ধরাধরি করে হাঁসপাতালে নে গেছে।

নবীন। অ্যাঁ! সে কি? নীহারিকাকে হাঁসপাতালে নে গেছে? অ্যাঁ! অ্যাঁ! ঘোঁড়া থেকে পড়ে গেছে?

গাঙ্গুলী। কোমরের হাড় ভেঙ্গে গেছে? তা হলেত দিদি বাবু মাটী? আঃ আত্মার কথার সময় এত বিঘ্নও ঘটে?

রঙ্গিণী। Very nasty accident !! আমি Dy. Magistrate হবার আঁচে দিন কতক ঘোঁড়ায় চড়ব মনে করেছিলাম but the naked beasts presented a very hideous sight, তাই জন্য সে resolve পরিত্যাগ কল্লেম।

গাঙ্গুলী। যা বলেছেন ন্যাংটা ঘোড়াগুলোকে ভারি বেহায়ার মত দেখায়। আর যে বিদকুটে গড়ন ধুতি চাদর পরাবারও তো সুবিধে নেই।

রামহরি। আড়গড়ার ঘোঁড়া?

নবীন। না আমি সম্প্রতি তাকে একটা ঘোঁড়া কিনে দিয়েছিলাম।

রামহরি। তা হলেত Damage case দাঁড় করান যায় না।

হরে। আপনি শিগ্‌গির আসুন, দেরী করবেন না।

নবীন। অ্যাঁ হাঁসপাতালে নে গেছে? চল্। হাড় ভেঙ্গে গেছে?

[হরে ও নবীনবাবুর প্রস্থান]

বিষ্ণু। তাইত বড় দুঃখের কথা। আহা নীহারিকা ননীর পুতুল, না জানি তার কতই আঘাত লেগেছে।

রঙ্গিণী। Really very sorry। নবীনবাবু বড় ভাল লোক, একজন real patriot। তার পর বিষ্ণু! খপর কি? কাল না তুমি আমার বাড়ীতে সন্ধ্যার সময় যাও।

রামহরি। (বিষ্ণুর প্রতি) ঘোঁড়াটা কি নতুন কেনা?

বিষ্ণু। আজ চার পাঁচদিন হল কিনেছেন।

রামহরি। কোন ভয় নেই। আমার ওপর ভার দেনত আমি সব clear করে দিতে পারি।

বিষ্ণু। হাড় যদি একেবারে ভেঙ্গে গে থাকে, তা হলে সহজেতো কিছু করা যাবে না।

রামহরি। হাড় ভেঙ্গে যাওয়াইত চাই। যারা বেচেছে তাদের নামে case আনব। ভাল বলে এমন unbroken wild horse চালায় কেন। দশ

হাজার টাকা damage-এর দাবী দোব, যাতে দাঁড়ায়।

গাঙ্গুলী। আমি তবে এখন মাছ দুটো কুটিগে।

[প্রস্থানোদ্যত]

বিষ্ণু। গাঙ্গুলী! যেও না একটা কথা বলে দেব।

রঙ্গিণী। উনি কে?

বিষ্ণু। ওহো আপনার সঙ্গে ওঁর এখনও introduction হয়নি। উনি সম্প্রতি আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হ'য়েছেন। অতি উদার প্রকৃতি, বিনীত স্বভাব।

রঙ্গিণী। বটে? আপনার নাম?

রামহরি। পুরণ Law report খুঁজে precedent বার করা যায়। আমার বিশ্বাস case ঠিক দাঁড়ায়।

রঙ্গিণী। (গাঙ্গুলীর প্রতি) আপনার নাম?

গাঙ্গুলী। আমার নাম পঞ্চু।

রঙ্গিণী। পঞ্চু কি?

গাঙ্গুলী। শুধু পঞ্চু। জাত তো আর এখন বলচি না, এখন অজাতে এসেছি যে।

রঙ্গিণী। (বিষ্ণুর প্রতি) regular baptism?

বিষ্ণু। হাঁ।

রঙ্গিণী। বড় সুখী হলুম। Missionary work?

বিষ্ণু। হাঁ। (গাঙ্গুলীর প্রতি) এর নাম Miss রঙ্গিণী গুপ্তা। ইনি আমাদের Calcutta Universityর glory।

গাঙ্গুলী। কালকা স্টীর ফুলুরী—বটে? (রঙ্গিণীকে প্রণাম করল) পায়ে রাখবেন।

রঙ্গিণী। Really বিষ্ণু! কাল তুমি আমার বড় disappoint করেছ। এই আসে এই আসে করে, সারাটা সন্ধ্যা একলা হাই তুলে কাটিয়েছি।

বিষ্ণু। একটু ঝঞ্ঝাটে পড়েছিলুম।

রঙ্গিণী। যাও মিথ্যা কথা কয়ে পাপ বাড়িও না। তোমার মত এমন heartless—

(উমেশের প্রবেশ)

উমেশ। যে উত্তুরে বাতাস—নেশা থাকতে দেয় না। (রঙ্গিণীকে দেখিয়া) ও বাবা তুমি কে? বিষ্ণু! এ যে বেড়ে জিনিস হে—

বিষ্ণু। উমেশ বাবু এখন না—এখন না—এখন আপনি যান—উনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা—

উমেশ। তাত বুঝতেই পাচ্ছি—চেহারার চটকত মন্দ নয়। আজকাল কি বাড়ীতে আন্‌চ ?

গাঙ্গুলী। আপনি এখন যান,—যান,—উমেশ বাবু—ফুলুরী দিদি সোজা লোক নয়।

উমেশ। আরে যাঃ ! তোমার নাম কি ভাই ?

রঙ্গিণী। কে আপনি ?

উমেশ। আমি উমেশ।

রঙ্গিণী। You do not at all look respectable। আপনি কি নেশা টেশা করেন ?

উমেশ। অটি শৈশবকাল হইটে। আমি নিজে তত respectable নই কিন্তু আমার বোনাই বাবু বড় respectable। তোমার এই বাবুরা দুবেলা তাঁর খোসামোদ ক'ত্তে যান।

গাঙ্গুলী। উমেশ বাবু—উমেশ বাবু—

উমেশ। আরে যাঃ। বিবি সাহেব—তোমার নাম।

রঙ্গিণী। আমার নাম Miss রঙ্গিণী গুপ্তা।

বিষ্ণু। উনি একজন অতি উচ্চ শিক্ষিতা স্ত্রীলোক।

উমেশ। বেশ—বেশ—বড় সুখী হলেম। তা তুমি লেখা পড়া জেনে এই সব গাধাগুলোর সঙ্গে মিশেছ বাবা ? যারা নেশা করে না তাদের কাছে মজা পাবে ? এস তুমি আমার সঙ্গে এস—তুমি তোফা ভদ্দর মেয়ে মানুষ। উলুবনে মুক্তো কেন ধন ?

গাঙ্গুলী। উমেশ বাবু—উমেশ বাবু !

উমেশ। আরে যাঃ—আঃ এস না গো—না না—Country নয়—ভাল জিনিস খাওয়াব—এস না—

রামহরি। (উঠিয়া) আর defamation এর বাকি কি ? সাক্ষীও দুজন আছেন। (রঙ্গিণীর প্রতি) কি বলেন আপনি ?

উমেশ। ও বাবা ! তুমি আবার কে ? তোমাকে চাই না বাবা। একে বেটাছেলে আমার দুচক্ষের বিষ, তার ওপর তুমি বদ চেহারা। আমার কেমন যে স্বভাব, সেই ছেলে বেলা থেকে গো, মেয়েমানুষ বড় ভালবাসি, আর বেটাছেলে বড় ঘেন্না করি। (রঙ্গিণীর প্রতি) এইখানেই একটু আনাব ?

রামহরি। (মিস গুপ্তের প্রতি) এখন আপনি আমায় verbal order দিন, পরে একখান ওকালত নামা দেবেন। এ রকম case-এর একটা বিশেষ সুবিধে এই আসামী কয়েদও হয়, আর damage-এর টাকাও পাওয়া যায়।

উমেশ। ও বাবা, উকিল ?—এখানেও ব্যবসা ভোলনি বাপ—ধন্যি। ওঃ দাড়ি বেরিয়েছে তাই চিনতে পারিনি—আমাদের ছিমন্তর ব্যাটা ? বাবা এখান থেকে সরে পড়, ঘটী-বাটী চুরী গেলে তোমায় খপর দেব। যাও—যাও—আঃ যানা ব্যাটা।

রামহরি। জান তুমি কার সঙ্গে কথা কচ্চ ? তোমার মত ঢের মাতালকে আমি জব্দ করে ছেড়ে দিয়েছি।

উমেশ। মাইরি এই কথাটা নেহাত আহাম্মকের মত বলিসনি বাবা। জব্দ করে ছেড়ে দিয়েছ কি এখনও জব্দ কর্চ্চ, যে জাদু। তোমার অই বদ চেহারার দিকে আমার এক একবার চাওয়াচ্চ, আর অতি কম দুআনা করে আমার নেশা নষ্ট কচ্চ, তার ওপর কাণের গোড়ায় ট্যাঁক ট্যাঁকানি। বিবি সাহেব। এ ছোটলোক বেটাদের কাছে আর থেকে কাজ নেই। শোন না, আমার বোনাই বাবুর বাড়ী চল তাঁর সঙ্গে আলাপ করে দেব এখন। তুমি জান না তাঁর বাড়ী একটী চিড়িয়াখানা। (বিষ্ণু প্রভৃতিকে দেখাইয়া) এই রকম কত যে জানোয়ারকে রোজ তাঁকে খোরাক দিতে হয় তার শেষ নেই।

গাঙ্গুলী। উমেশ বাবু বাড়ী যাও।

উমেশ। আরে যাঃ—

রঙ্গিণী। You must measure your words properly, all this may end very badly.

উমেশ। শুধু বাদলী কেন ? গোড়াতে সকলেই অমন করে। নাও চোক রাঙ্গান রাখ না বাবা ! ওসব ঢং এই ব্যাটাদের দেখিও। আমি এ বয়সে অনেক দেখলুম।

বিষ্ণু। (রঙ্গিণীর প্রতি) আপনি বাড়ীর ভেতর যান।

রঙ্গিণী। What nonsense ? তুমি তোমার নিজের বাড়ী থেকে ও মাতালটাকে তাড়াতে পার না ?

বিষ্ণু। আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি বাড়ীর ভেতর যান।

গাঙ্গুলী। ফুলুরি দিদি, বাবুর কথা শুনুন বাড়ীর ভেতর যান। মাতালকে

বিশ্বাস নেই, একটা না একটা ব্যাভ্রমের কথা বলতে পারে।

[রঙ্গিণীর প্রস্থান।

(উমেশের প্রতি) উমেশ বাবু! যাও যাও, নাওয়া খাওয়া করগে।

উমেশ। আরে যাঃ! আরে দূর কর, যখন আমার জানকীই হরণ হয়ে গেল, তখন আর এখানে বসে কি করব?

[প্রস্থান।

গাঙ্গুলী। (রামহরির প্রতি) রামহরি বাবু, যান আপনিও স্নানটান করুন গে। বেলা হয়েছে।

রামহরি। যাই। Case ঠিক establish কত্তাম, একবার Session-এ ঠেলে ফেলাতে পাল্লে, দশ হাত জলের নীচে, বিলক্ষণ দু পয়সার ভরসা ছেল, ভারি ফস্কেছে।

[রামহরির প্রস্থান।

বিষ্ণু। গাঙ্গুলি! এখন তোমার কোন কাজ আছে? Mr Mukerjeeর কাছে তোমায় একবার পাঠাতে ইচ্ছা করি। একখান বড় জরুরী চিঠি আছে তাঁর এখনি পাওয়া চাই। ব্যাজার হয়ো না, দেশের কাজ আমার ও যেমন তোমার ও তেমনি।

গাঙ্গুলী। আজ্ঞে, এখন দেশের কাজ কত্তে হলে মাছ দুটো পচে, মশায়! খেয়ে দেয়ে দেশের কেন, বিদেশের কাজ পর্যন্ত করা যায়।

বিষ্ণু। আচ্ছা তবে আমি বেয়ারাকে দিয়েই পাঠাই। তুমি একটু হুঁসিয়ার আছ গেলে ভাল হ'ত।

গাঙ্গুলী। পিয়ারার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সেত আপনার জন্যে সারা হল। সেই যে আমাদের মোটা মোটা গানের বই, তাই একখান কিনেছে। "তুমি পরমানন্দ প্রাণময় হে, হে জননী, ব্রহ্মাণ্ডপতি" অই গানটা আপনি গেলে, গাইবে ঠিক করেছে। ও "যারে বিদেশী বঁধু ফঁধু" তো আপনার ভাল লাগবে না।

বিষ্ণু। তার যদি সত্যই সুমতি হয়ে থাকে, আমাদের আশ্রমে আসুক। যাদের কেউ নাই, তাদের আমরা আছি তুমি তাকে বলো।

গাঙ্গুলী। তার কেউ নেই কি মশায়? এক মাইত তার এক সহস্র, বেটী পয়লা নম্বর ঘাঘী। তার ওপর মল্লিকদের বাড়ীর ছেলেরা অষ্ট প্রহর ঘিরে আছে। তাত নয়, তার আপনার ওপর একটু নজর আছে। বলে বিষ্ণু বাবু যদি

পায়ে রাখেন ত তিনি যা বলেন তাই করি। একবার কাল সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বেড়াতে গেলে হয় না।

বিষ্ণু। অতিশয় মন্দ জায়গায় বসতি তার। সেখানে হামেসা যাওয়া উচিত নয়।

গাঙ্গুলী। আপনাকে কেউ দেখলে ত। রামের বাবা রাবণ এলেও আপনাকে ধর্ত্তে পার্ব্বে না, এমন বেটা গাঙ্গুলির বাচ্চা আমি নই। আর জায়গা মন্দই বা এমন কি, ওখানে দুদিন এবাড়ী ওবাড়ী কল্লে ও পিয়ারার মতন অনেক পাওয়া যায়। একবার ওপাড়ায় নেগে ফেলতে পাল্লে আপনাকে দে আমি অনেক সৎকাজ করিয়ে নিতে পারি।

বিষ্ণু। আচ্ছা বিবেচনা করি।

গাঙ্গুলী। আর একটা কথা। যেদিন থেকে আপনি খাওয়াচ্চেন পরাচ্চেন, সে দিন থেকে আপনার কথা ছাড়াত আমি কাজ করি না। কালীঘাটেও যাই না, ঠাকুর দেখলে গড়ও করি না। তবে আমার পরিবার বলছিল যে গাইটা বিইয়েছে, এ রকমটা আমার হবার আগে মাগী মানিকপীরের সিন্নি মেনে রেখেছিল, তা আপনি যদি হুকুম দেনত, বাড়ীতে একদিন মানিক-পীরের গান দিই। আর মানিকপীরত ততটা হিঁদুর দেবতা নয়, আপনার ত হিঁদুর ঠাকুরকেই মানতে মানা।

বিষ্ণু। যাও পাগলামী করো না। ভক্তি সহকারে তাঁর মহিমা গান কর, তা হলেই সকল পীরের গান হবে।

গাঙ্গুলী। যে আজ্ঞে তাই করব, চামরটা দোলাতে আপনার আপত্তি নেই?

বিষ্ণু। চামর ব্যজনে আপত্তি হতে পারে না। পবন অহোরাত্রি তাঁর চামর ব্যজন করে।

গাঙ্গুলী। সব দলেত আর এক লোক নয়, আমি যে দলের কথা বলছি তাদের যে চামর দোলায় তার নাম পবন নয়, জমীরদ্দি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রমানাথ বাবুর অন্তঃপুর।

নলিনীবালা।

নলিনী। বামা!

(বামার প্রবেশ)

বামা। কেন গা—

নলিনী। একবার হরের মাকে ডাকত।

বামা। এত বেলায় আবার হরের মাকে কেন বাবু। ঐ কি কতকগুলো ছাই ভস্ম লিখছ, তাই তাকে শোনাবে। তুমি বল বাবু আমি শুনচি।

নলিনী। আমর তুই শুনবি কি?

বামা। তা কি করব বল, আমার কি ইচ্ছে যে শুনি, না শুনিয়েত তুমি উঠবে না। বেলা ১১টা হয়ে গেল, ওঠ না পাইখানায় যাও, কাপড় চোপড় কাচ, কাজ চোকাও না বাবু। ঝি চাকরদের ছোটলোকের দেহ বলে কি একটু আরাম বিরেমের সাধ নেই। ছিঃ গেরস্থ বউ, এত কেরাণী হলে চলে কি?

নলিনী। তুই হরের মাকে ডেকে দে, যা।

বামা। ধন্যি আমাদের বাবুর সহি। আমরাত ছোটলোকের মেয়ে, আমার ও রকম মাগ হলে, আমি ওকে তেজ্যিপুত্তুর কত্তুম।

[বামার প্রস্থান।

নলিনী। অসময়ে কোথা হতে বসন্ত এসেছে
বহিছে মলয় মৃদু ঝুর ঝুর ঝুর—
জ্যোৎস্নার ওড়না গায়, চাঁদের সভায়,
হাসিতেছে তারাকুল মধুর মধুর ॥

বেশ হয়েছে—বড় সুন্দর মিলেছে।

এই বসন্তের রাতে, সবাই ঘুমায়,
কোথা তুমি, বঁধু মোর, আছি বুক পেতে,
চেয়ে আছি নিরিবিলি পথপানে, প্রাণ
একবার এস প্রাণে এ মধুর রেতে ॥

আহা আহা ভারি সুন্দর উতরে গেছে। এর পরে যে আর চার লাইন লিখব, তাতে যদি "নিকুঞ্জ" "পাপিয়া" "মু'খানি" আর "নিঝুম" এই কথাকটা লাগাতে পারি, তা হলে আর আমায় পায় কে? এখনও হরের মা এল না?

(পিসীর প্রবেশ)

পিসি। হ্যাঁগা বউমা। মাসকাবারের ত আজ সবে দশদিন, ফি-মাসে যেমন আসে, এবারে ও তো তেম্নি তিন সের মাসকড়াই এসেছেল, এর মধ্যে ফুরুল কেমন করে? আধসেরই নয় বড়ি দেওয়া হয়েছে ধরি।

নলিনী। আচ্ছা পিসীমা, "জ্যোৎস্নার ওড়না গায়" এর ভাবটা যদি ঠিক বোঝাতে পার, তুমি যা খেতে চাইবে, আমি তাই খাওয়াব।

পিসি। কে জানে বাছা, আমাদের বাপ চোদ্দপুরুষেও ওসব কথা কখন শোনেনি।

নলিনী। এর ভেতর মস্ত কথাটা তুমি কি পেলে? আমি খুব সোজা, খুব সাদা অথচ মিষ্টি, কথা না পেলে কখন poetry লিখি না। "জ্যোৎস্না" বুঝতে পাল্লে না? শুক্লপক্ষে জ্যোৎস্না ওঠে না?

পিসি। ও আমার পোড়া কপাল!! আবাগের বেটীর সব উল্টো। সে জোতসোনাও নয়, রূপোও নয়, জোচ্ছনা।

নলিনী। অই জোচ্ছনার ভাল কথা হচ্চে জ্যোৎস্না।

পিসি। নে বাবু আমার চুল পাকল, দাঁত পড়ল, আমাকে আর তুই কথা শেখাসনি। অম্বিকে কথক যার পাড়াসম্পর্কে আমার মামা হত। আমাদের বংশের মেয়েকে আর কথা শেখাতে হবে না বাবু। এখন যা জিজ্ঞেস কচ্চি বল।

নলিনী। "জ্যোৎস্নার ওড়না গায়, চাঁদের সভায়
হাসিতেছে ভারাকুল, মধুর মধুর"।

পিসি। হা দেখ বউমা। ও রকমটা একশবার করো না। গেরস্থর মেয়ে দিন-রাত্তির অমন কাগজে কলমে থাকলে, লক্ষ্মী ছেড়ে যায়। তুমিত মেয়েছেলে গো, পালেদের মেজছেলে ঐ রকম দিন রাত্তির বই নিয়ে বিজ বিজ কত্ত, শেষ খীষ্টান হয়ে গেল। তখন তার দাড়ি বেরিয়েছে, নেহাত এক রত্তিটি নয়।

[পিসীর প্রস্থান।

(রমানাথের প্রবেশ)

নলিনী। (রমানাথের প্রতি) একি তুমি এখনও বেরোওনি? আমি মনে করেছিলুম বেরিয়ে গেছ?

রমানাথ। তুমি ত সব সময় বাড়ী থাক না, বাড়ীর খবর রাখবে কেমন করে বল?

নলিনী। তা বেশ হয়েছে। আজকের লেখাটা দেখ।

রমানাথ। ক্ষ্যামা কর, এত বেলায় তোমার লেখা দেখতে গেলে চাকরী থাকবে

না। এখন ট্রাম ভাড়া দাও।

নলিনী। দু মিনিটও লাগবেনা। আজ ভারি চমৎকার হয়েছে।

রমা। উদ্দিশে সুখী হচ্ছি। তুমি পয়সা কটা দাও—

নলিনী। যে না শোনে আমার মাথা খায়।

"অসময়ে কোথা হতে বসন্ত এসেছে"

রমা। বসন্ত এসেছে বেশ করেছে। তুমি ছোঁয়ানেপার ভেতর থেক না, তা হলে তোমার গায়ে আসতে পারে। দেখ, এখন তুমি পদ্য লিখ্‌ছ, এর পর দুটী খেয়ে দু'ঘণ্টা ঘুমুবে, বিকেলে খুব কাজ করত চুলটা বাঁধবে, বড় জোর একটা পান খেয়ে একবার আরসীতে মুখখানা দেখবে। আমায় এখন আপিস যেতে হবে, সারাদিন ঠিক দিয়ে মাথা ধরাতে হবে, সাহেবের দুটো মধুর বাণী উপরি পাওনাও আছে। দুর্গা নামটা স্মরণ কচ্চি, কেন এ সময় বাগড়া দাও।

নলিনী। এতক্ষণ যে পড়া হয়ে যেত।

রমা। নাও পড়।

নলিনী। তোমার ভাল লাগচে না—তবে পড়ব না।

রমা। বেশ লাগচে—পড়। একটু শিগ্‌গির নাও ভাই—সাড়ে এগারটা হয়।

নলিনী। তুমি রাগ কল্লে—

রমা। না ভাই, শিগ্‌গির পড়ে নাও।

নলিনী। না তুমি রাগ করেছ।

রমা। না না রাগ করিনি।

নলিনী। হ্যাঁ তুমি রাগ করেছ।

রমা। তোমার গায়ে হাত দে বলছি রাগ করিনি—শিগ্‌গির পড়ে নাও।

নলিনী। আচ্ছা একবার হাস—তাহলে বুঝব—রাগ করনি।

রমা। আঃ ভারি জ্বালাতন করেছ। এইত হাসচি—হল?

নলিনী। ও হ'ল না—ভাল করে হাস?

রমা। এ তাড়াতাড়ির সময় এর চেয়ে ভাল করে কেমন করে হাসি ভাই?

নলিনী। আচ্ছা এই পয়সা নাও। হাসলে না, সারাদিনের মত মত আমার মনটা খারাপ করে তুমি সুখী হলে? বেশ যাও—

রমা। আচ্ছা নলিনী তোমার কি একটু বিবেচনা নেই। হাসি আসে না কেমন করে হাসি বল। ঘড়ির দিকে চাইচি আর প্রাণের ভেতর কেমন করে উঠছে, মুখে হাসি আসবে কেন? আমাদের সাহেবের মুখ যে একবার দেখেছে,

জন্মের মত হাসি তার জগন্নাথকে দিতে হয়েছে, আমার বড় আমোদের প্রাণ, তাই তবু ভুলেও হাসি।

(পিসীর প্রবেশ)

পিসি। বউমাকে ঝাড় ফুক করাও বাছা—ওর ও একটা ব্যাম। বসে লিখ্‌ছে, এমনি মগ্ন গা, চকের উপর দুখান কাপড় শুকুচ্ছিল, ভিখিরীতে নে গেল।

রমা। আপদ গেছে।

[রমানাথের প্রস্থান।

পিসি। তোমাদেরই জিনিস, যায় যাক, থাকে থাক, আমার গেরো, আমি ধড়ফড় করে মরি। এখন উঠবে, না সারাদিন হাঁড়ি কোলে করে বসে থাকব?

নলিনী। হরের মাকে ডাকতে পাঠিয়েছি, সে না এলে কেমন করে উঠি বল? এতক্ষণ উঠতুম তো, তা সে কপাল কি। ওঁকে বল্লুম, উনি হাজার কথা কইলেন, কিন্তু একবার শোনবার তাকুত হল না! ভগবান এ ক্ষমতা যাকে দিয়েছেন, সে বুঝেছে, এ আনন্দ একলা ভোগ করবার নয়, অপরকে এ আনন্দের ভাগ না দিলে কোন মতেই মন ওঠে না।

পিসি। তুমি হলে বড়মানুষের মেয়ে ও যে হল গরীবের ছেলে বাছা; আপিস যাবার সময় আনন্দ দিতে গেলে চলবে কেন? তা হরের মাকে আনন্দ দিয়ে আমাকে বোলো ভাত বাড়ব। আনন্দটা কিন্তু শিগ্‌গির সেরে নিও!

(মাষ্টারণীগণের প্রবেশ)

গীত

আল্‌তা ভাঙ্গা ঠোঁট, আড়নয়নে চোট,
পনেরয় পা দিছিস যারা আর যুবতীর সেট!
চাস যদি জ্ঞানের রাতি ফাঁপা নয় নিরেট!!
তালপাত্‌ কুচ কামকো নেই এখন চলে না সেলেট—
মুছে হৃদয়-প্লেট, আগে সুরু করাই প্রেমের alphabet,
সেকেলে বিদ্যাসাগর, ক, খ, গ, out of date;
এ বয়েসে বুলিয়ে দাগা করিসনেকো মাথা হেঁট!!
শুধু বয়ে কি হয় ছাই
সরল ভাষায় কাণে কাণে মরেল ঢেলে যাই,
নেহাত কথায় না কুলুলে ইসেরা চালাই—

শেলাই, ঢালাই, কি না শেখাই,
বনিয়ে দিই first-rate ;
আমরা ছুঁচ হয়ে enter করি, ফাল হয়ে cross করি gate

১ম মা। এ বাড়ীর mistress কোথা গা ?

নলিনী। আসুন, আসুন, বসুন।

পিসি। বউমা ! ওদের সঙ্গে ছোঁয়াছুয়িটা কোরো না ; ওরা সব আধ সাহেব, ওরা পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায়, নানান অখাদ্যি খায়।

নলিনী। আচ্ছা, আচ্ছা, পিসি তুমি পুজো আহ্নিক করগে।

পিসি। (মাষ্টারণিগণের প্রতি) বাছারা ! বউমার আমার ছোট ছেলে কোলে, ওঁর সঙ্গে ছোঁয়াছুয়িটা কোরো না।

[প্রস্থান

মা গণ। (ঐক্যতান হাস্য)

২য় মা। ও বুড়ী কে ?

নলিনী। আমার পিসশাশুড়ী।

৩য় মা। আপনার স্বামী কোথায় ?

নলিনী। তিনি এই আপিস গেলেন। আমি এই একটা বসে বসে poetry লিখ্‌ছিলেম, "বঙ্গ-বান্ধবে" পাঠিয়ে দেব বলে, তাই তিনি দেখছিলেন, দেখে ভারি খুশি হয়েছেন। আপনাদের এই পথ দে মাঝে মাঝে গাড়ী করে আমি যেতে দেখেছি, দয়া করে আমার এখানে এক এক বার হয়ে গেলেই পারেন। দেখুন না poetry টা কেমন হয়েছে ?

"অসময়ে কোথা হতে বসন্ত এসেছে"—

১ম মা। বেশ হয়েছে। আপনি ত তবে একজন poet দেখছি। Wool টুল বুনতে পারেন, জুত, কম্ফর্টার টুপি।

নলিনী। না ; শুনুন না।

"বহিছে মলয় মৃদু"

১ম মা। শেখেন না কেন ? carpet-এর ওপর বেশ সাঁচ্চার কাজ আমরা শেখাতে পারি।

নলিনী। শিখলেই হয়। আচ্ছা, এখানটার ভাব কেমন দেখুন,—

"জ্যোৎস্নার ওড়না গায়"

২য় মা। বড় চমৎকার হয়েছে। কেবল উল কেন সুতোর কাজও আমাদের বেশ জানা আছে। গ্রেন কাপড়ের উপর সুতোর ফুল—

নলিনী। সাদা কাপড়ে সুতোর ফুল মানায় বড় সরেস। তার পরের লাইনটা দেখুন

"হাসিতেছে তারাকুল মধুর"

৩মা। আপনার স্বামী কোন আপিসে কর্ম্ম করেন ?

নলিনী। কোম্পানির আপিসে। দ্বিতীয় stanzaর প্রথমেই বলছি,

"এই বসন্তের রাতে"

২য়। ওত আপনার "প্রাচীন কাহিনীর" মত লেখা, আমরা বুঝতে পেরেছি ; আপনি ছবি আঁকতে পারেন ?

নলিনী। একটু একটু পারি। এ কবিতা লেখাও এক রকম ছবি আঁকা ;—

"সবাই ঘুমায়"

৩মা। ওয়াটার কলার আঁকেন—

নলিনী। "কোথা তুমি বঁধু মোর"

১মা। অয়েল-পেণ্টিং ?

নলিনী। "আছি বুক পেতে"

১মা। আমাদের charge বড় moderate। যদি বলেন তো আপনাকে পেণ্টিং শেখাই।

নলিনী। "চেয়ে আছি নিরিবিলি পথপানে"

২মা। তা বৈকি বেলা ১২টা থেকে ১টা পর্য্যন্ত আপনার কাছে থাকতে পারি।

নলিনী। "প্রাণ ! একবার এস প্রাণে"

১মা। এ পাড়ায় ত আমাদের আসতেই হয়।

[পিসির প্রবেশ]

পিসি। (মাষ্টারণীগণের প্রতি) মা লক্ষ্মীরা আর ধুনোর গন্ধ দিও না, একবার ছাড় পেয়ে নিগ, আমি হাঁড়ি তুলি।

নলিনী। আঃ আমার খাবার বেড়ে রাখগে আমি একটু বাদে খাব। (মাষ্টারণীগণের প্রতি) আসুন আমার শোবার ঘরে নিচ্ছলে আপনাদের শোনাই গে।

মা গণ। চলুন চলুন।

মাষ্টারগীগণের গীত

মিলেছে রতনে রতন—
আমরা বেড়াই ডালে ডালে,
পাতায় পাতায় তোমার গমন॥
আমরা ছিপে ধরি মাছ—
ছুটো ঠুকরে চলে যায়, ছুটো ওঠে বা ডাঙ্গায়,
তুমি এক ক্ষেপেতে বোঝাই কর,
জালে তোমার আঁচ—
আমরা ফুঁয়ে ধুলো ওড়াই
তুমি ওড়াও সুঁদোরবোন!

তৃতীয় দৃশ্য

সার্ দীনেন্দ্র দয়ালের বৈঠকখানা

মধু ও উমেশ

মধু। তা হ্যাঁগা মামা বাবু! পূজোর সময় না হয়ে, এখন হল কেন?

উমেশ। মধো! গণ্ডা আষ্টেক পয়সা ধার দে বাবা—মাথাটা ভারি ধরেছে। বড্ড nausea। এক কোয়াটার না আনালে চলে না।

মধু। পয়সা কোথা পাব মামা বাবু? হরি বল, তোমরা দিলেত পাব।

উমেশ। এই ৩২ বচ্ছর ধরে আমার বোনায়ের পয়সা যে ছুচোকো চুরি কচ্ছ যাদু! পয়সা কোথা পাবে?

মধু। যাও, যাও –বল না মামাবাবু, উটোনে হবে তা, ভারা বাঁধলে না?

উমেশ। ওপ'রের হলে হবে, ব্যাটা বকাসনি যা।

মধু। হ্যাঁগা, তা কত বায়না হয়েছে?

উমেশ। Conference হবে তার বায়না কিরে ব্যাটা?

মধু। তারির কথাইত বলছি গো। তারা কিসের পালা করবে, মামা বাবু? নন্দ ঘশোদার কথা?

উমেশ। বেটা যাত্রা ঠাউরে বসে আছ, বুঝি। ওঃ তাই বলছিলি পূজোর সময়

না হয়ে এখন হ'ল কেন? বাবা মধু শোন, দুপয়সার গজা আনতে দিলে তার ভেতর থেকে আধ পয়সাত বেশ বেমালুম পাচার কর, আর অন্য সময় এমন সোঁদা আহাম্মকটা কেমন করে ব'নে যাও বল দেখি।

[মধুর প্রস্থান।

(জগন্নাথ মান্না ও সম্ভু শিরোমণির প্রবেশ)

জগ। (শিরোমণির প্রতি) তা হ'লেই হল, আমরা যে আর্য্যসন্তান, তাত আপনাকে স্বীকার ক'ত্তে হবে?

উমেশ। ওঁর বাবাকে স্বীকার ক'ত্তে হবে? পাঁচ পাঁচটি সাজোয়ান আর্য্যের ওরসে এক একটী মান্নার উৎপত্তি, পরাশর একথা খুলে লিখে গেছেন? মান্নাবংশটাই কি সহজ? শিরোমণি খুড়ো বুঝি তা স্বীকার করেন না?

জগ। (শিরোমণির প্রতি) তা যদি স্বীকার করেন যে আপনি আর্য্য সন্তান—

শিরো। এর ভেতর তর্ক উঠতে পারে যে—

উমেশ। ওর ভেতর তর্ক উঠিও না বাবা। যখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে মান্না খুড়ো আর্য্যসন্তান, তখন তুমিও আর্য্যসন্তান না হ'য়ে যাও না, কেন না তোমার জননীর সহিত কোন মান্না প্রেমিকের যে অতি নিকট বন্ধুত্ব ছিল সে বিষয় আমরা ইতিহাস পড়ে বেশ অবগত হ'য়েছি। আর যে হেতু মান্না খুড়োও আমার খুড়ো, আর তুমিও আমার খুড়ো, আর এ কথা যখন স্বীকার কত্তে হচ্ছে যে মান্না খুড়ো আর্য্য সন্তান, তখন তুমি যে আর্য্যসন্তান এ কথার ভিতর তর্ক আসতেই পারে না।

জগ। উমেশ থাম। যখন এক বংশ হতেই আমাদের সকলের উৎপত্তি—

উমেশ। সকলকে জড়িও না বাবা।

শিরো। তুমি মূর্খ। তুমি মান্না, আর আমি মুকুটী বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, তোমার আমার একবংশ হতে উৎপত্তি?

জগ। আপনি ভুল কচ্ছেন, আমি সে বংশের কথা বলছি না।

শিরো। এই বংশ রহস্যইত আমাদের বর্ত্তমান সমস্যার অংশ। আপনি কোন বংশের কথা বলছেন তবে?

উমেশ। যে বংশে কংস জন্ম গ্রহণ করে বিংশতি সের মাংস আহারপূর্ব্বক যদুবংশ ধ্বংস করত, হংসে আরোহন করে, ভ্রংশ ও অভ্রংশ অসুরদ্বয়কে নির্ব্বংশ করেন।

জগ। উমেশ পাগলামি করো না, কাজের কথা হচ্ছে।

উমেশ। কও বাবা, কিছু পয়সা ট্যাঁকে আছে হাওলাত দিতে পার ?

জগ। আমি সেই আর্য্যাবর্ত্তের আদিম অধিবাসীগণের কথা বলছি। যে বংশ হতে ভারত সন্তানগণের প্রথম উৎপত্তি। এ বংশ সে বংশ, তো হালের নির্ব্বাচন। অতএব যদি এ কথা স্বীকার করা যায় যে আমরা আর্য্যসন্তান, দেখতে হবে আমাদের এ অধঃপতনের কারণ কোথায় ?

উমেশ। পথে এস বাবা, কারণ কোথায় পাওয়া যায় আমি বেশ জানি। আমার অনাটন কেবল পয়সার। গণ্ডা আষ্টেক পয়সা বার কর দেখি ধন, দু মিনিটের ভেতর কারণ তোমার নাকের ওপর ধরে দেব।

জগ। শিরোমণি মশায়! আমাদের এ দুর্গতির কারণ অনুসন্ধান কত্তে বেশী দূর যেতে হয় না, কারণ অতি নিকট।

উমেশ। পাঁচ মিনিটের পথ, গরাণহাটার মোড়।

জগ। আমাদের এত দুর্দ্দশার কারণ আমরা অনাচার-পরায়ণ। আমাদের অনাচার-পরায়ণতা আমাদের সর্ব্বনাশ কচ্ছে।

উমেশ। কথাটা ওল্টালে বাপ—বেশ ভরসা দিয়ে আনছিলে যে।

জগ। আমাদের বিদ্যার্জ্জনে কিছু হবে না, বক্তৃতায় কিছু হবে না, সংবাদ পত্রে কিছু হবে না, যত দিন আমরা আমাদের কদাচারীতার মূলে কুঠারাঘাত কত্তে না পার্ব্ব, ততদিন আমাদের দুর্গতির বৃদ্ধি বই হ্রাস হবে না। পবিত্র পঞ্চনদবাসী দেব-স্বভাব সেই আর্য্য রাজর্ষিগণের বংশধরেরা যেদিন ম্লেচ্ছ প্রসাদ মস্তকে ধারণ ক'রে, আপনাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করেছে, পবিত্র গঙ্গোদক পরিত্যাগ করে যে দিন হতে বরফে তৃষ্ণা নিবারণ কত্তে শিখেছে, আর্য্যবাস ভারতবর্ষ যে দিন দুষ্ট রেইলওয়ে-কালসর্পের দেহ লতায় আবৃত হয়েছে—

উমেশ। যে দিন আর্য্যসন্তানগণ কলের জলে স্নান করেছে, সালসা খেয়েছে, Cod liver oil কিনেছে—

জগ। ঠিক, উমেশ। ঠিক, তোমার পরিহাস বড় গভীর, বড় মর্ম্মস্পর্শী, কিন্তু বড় সত্য।

উমেশ। আরো মর্ম্মস্পর্শী চালিয়ে যাচ্ছি, বাধা দাও কেন বাবা। যে দিনে আর্য্য-সন্তান পিরাণ গায়ে দিতে শিখেছে—কেমন বাবা হচ্ছে ?—যেদিনে মান্না বংশ নাঙল ছেড়ে Lecture দিতে সুরু করেছে, যে দিনে আমার মদের পয়সা ফুরিয়েছে, সেইদিন থেকে ভারতের সর্ব্বনাশ হয়েছে।

জগ। ও পাগলের কথা ছেড়ে দিন। কেমন শিরোমণি মশায়, আমার যুক্তি আপনি খণ্ডন কত্তে পারেন ?

শিরো। আমি কইতে পাচ্ছি না। আমি সে বংশের কথা এখনও ভাবছি, কিছু ঠিক করে উঠতে পাচ্ছি না। আপনি আমি একবংশ-সম্ভূত, এ কথার এখনও আমি ভাব গ্রহণ কত্তে পাচ্ছি না।

উমেশ। দূর বেটা নির্ব্বংশে, ও বংশের ব্যাপার তুই বুঝে উঠতে পারবিনি। তোর জননীকে জিজ্ঞাসা করিস, বংশ ব্যাপারে তিনি তো অপেক্ষা ঢের বেশী বহুদর্শী!

জগ। আচ্ছা আমি আপনাকে বেশ বিশদ করে বোঝাচ্ছি ধরুন আপনার—

উমেশ। বাবা, এখানে আর ধরো না, অই কোণের ঘরে যাও মনের সাধে যতক্ষণ ইচ্ছে ধর গে। আমার শরীরটা বড় ভাল নেই, আর কাণের পোকা বার করো না, যাও।

জগ। আচ্ছা, বেশ, আসুন। ঐ ঘরে আপনাকে ঠাণ্ডা হয়ে বোঝাইগে।

শিরো। স্নানাহারান্তে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি আলোচনা ক'রব এখন নয়, বেলাধিক্য হয়েছে।

জগ। অধিকক্ষণ নয় অতি অল্পক্ষণেই হতে পারে, আপনি আসুন না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(হরেন্দ্রলালের প্রবেশ)

হরেন্দ্র। মামা! মামা!

উমেশ। বলে পাঠাও।

হরেন্দ্র। মামা বড্ড মজা হয়েছে, ভারি—

উমেশ। বটে ? তোমার পিসী ঠাকরুণকে বাড়ীর ভেতর পাওয়া যাচ্চে না ?

হরেন্দ্র। দূর! তাতে আর ভারি মজা হ'ল কি ?

উমেশ। মিথ্যা নয়, তবে ?

হরেন্দ্র। কাল উইলসনের হোটেলে খেতে গেছলুম, হরে পরামাণিক আর তাতীদের মটো আমার সঙ্গে ছেল। দরদাম করে খেতে বসলুম, তিন ডিসে তিন টাকা, খাওয়া হবার পর বলে পাঁচ টাকা চাই। আমি ইংরিজী করে বল্লুম তিন টাকার বেশী দেব না। একটা সাহেব আমার হাত ধরে হিড় হিড় ক'রে টেনে নেগে আর একটা সাহেবের ঘরে ঢোকালে।

উমেশ। বাঃ বেঁচে থাক বাবা, কটা জুতোর ঠোক্কর মাল্লে ?

হরেন্দ্র। হুঃ জুতোর ঠোক্কর, তার চেয়ে ঢের মজা শোন না।

উমেশ। কি হাজোতে দেছল ?

হরেন্দ্র। দূর তা কেন ? সে সাহেবটা বল্লে, যা খাবার জন্যে তিন টাকা কড়ার, তার চেয়ে আমরা দুটাকার খাবার বেশী খেয়েছি, তাই জন্যে পাঁচ টাকা দিতে হবে। আমি বল্লুম, তেমন আমাদের পাতে যে অনেক পড়ে আছে, আমরা ত সব কুড়িয়ে বাড়িয়ে খাইনি।

উমেশ। ভেলা মোর বাপরে! এমন হিসেব বুঝতে শিখেছ তুমি ? তোমার বাবার estateএ আমি তোমাকে manager ক'রে দেব।

হরেন্দ্র। তার পর মজা শোন না। আমি বল্লুম বেশ, তার আর কি হবে এই টাকা নাও, বলে পাঁচ টাকা গুণে দিলুম। হরে আর মট্টোর মুখ শুকিয়ে গেল, বাইরে এসে তারা বললে দূর টাকা দিলি কেন ? আমি তখন কি কি কল্লুম বল দেখি ?

উমেশ। ঠিকত ঠাউরে উঠতে পাচ্ছি না বাপ, রাস্তার ধুলোয় গড়াগড়ি দিলে ?

হরেন্দ্র। দূর, আমি তখন একটা গলির ভেতর ঢুকে পকেট থেকে এক জিনিস বার করে তাদের দেখালুম। কি জিনিস জান ? দুটো কাঁটা আর একখানা চামচে। আমার সার্জের কোটে চারটে পকেট তাত জান ? তিনটে পকেটে তিনটে লুকিয়ে রেখেছিলুম ? কেমন মজা বল দেখি ?

উমেশ। মধো ! মান্না খুড়োকে ডাকত ? অই কোণের ঘরে আছে।

হরেন্দ্র। মামা তুমি হ'লে পারতে ? কথা কচ্ছ না যে ; কথা বন্ধ হয়ে গেল না কি ? বলি ও মামা—মামা।

(শিরোমণি ও মান্না খুড়োর প্রবেশ)

উমেশ। এস বাবা, এই আর একজন খাঁটি আর্য্যসন্তান পাওয়া গেছে, তাই তোমাকে ডেকে make over কচ্ছি। এঁর ক্রিয়াকলাপ এই অল্প বয়সেই বড় পবিত্র এবং বীরত্বসূচক, ভবিষ্যতে এর নিকট হ'তে অনেক আশা করা যায়। এঁর বাপের নিখরচা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, আর ইনি কাল উইলসেনের হোটেলে খেতেগে তাদের দুটো কাঁটা আর একখানা চামচে চুরী করে এনেছেন, আর কি চাও ? তোমাদের আর্য্যসন্তানের লিষ্টিতে এঁর নামটা খপ করে টুকে নাও ?

হরেন্দ্র। আমি Higher training-এর মিটিং-এ যাচ্ছি, এখন হবে না। মান্না বাবু। বিকেলে আপনি আসবেন, আপনাকে সেগুলো দেখাব এখন।

[প্রস্থান।

মান্না। ছিঃ ছিঃ উইলসনের হোটেলে খেয়েছেন !!

উমেশ। ওহো ঐটে মিল্‌ছেনা বটে ? যাক চুরীটা ত তোমাদের পবিত্র ক্রিয়ার সঙ্গে মিলেছে গো।

[মান্নার প্রস্থান।

শিরো। মান্না মশায় যে বংশ ব্যাপারটার কথা বল্লেন, তা আমি এখনও সম্যক উপলব্ধি কত্তে পাচ্ছি না।

উমেশ। বটে ? তুমি আমার সঙ্গে এস।

শিরো। না এখন আর তোমার সঙ্গে যাই কোথায় ? নির্জ্জনে বসে ও কথাটার ভাব গ্রহণ কত্তে হবে।

উমেশ। তুমি এস না, যেখানে তোমায় নেযাব সে অতি নির্জ্জন স্থান, মস্ত লোকের বাড়ী। দেখ ভবিষ্যতে তু পয়সার পিত্তেস আছে, তাঁর বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বন। চল না তোমার সঙ্গে পরিচয়টা করিয়ে দিইগে।

শিরো। আরে না ; এত বেলা এখনও স্নানাহার হয়নি, আহ্নিক বাকী।

উমেশ। আরে ছো ! একবার সেখানে তোমায় নে উঠ্‌তে পাল্লে, তোমায় দুর্গোচ্ছব করিয়ে দিতে পারি, তা আহ্নিক।

শিরো। এমন স্থান ? আচ্ছা চলেন, আমার বার্ষিকের বন্দোবস্ত করাতে পার্ব্বেন ?

উমেশ। এখনি—এখনি—এস।

শিরো। চলেন, চলেন, আর মনিষ্যিটাইকে ? কওতো ?

উমেশ। দেখবেই এখন, এস না।

শিরো। আরে নামটাই কর, আমি ত যাবার পথেই বসিচি।

উমেশ। গোলাপ—গোলাপ—

শিরো। গোলাপ ?

উমেশ। গোলাপ, আমাদের রামবাগানের গোলাপী।

শিরো। তুমি বড়ই বেল্লিক, একটা কসবীর ঘরে লইয়ে যাবার কথা কও ?

উমেশ। হঃ কসবী ; তোমার শ্বশুরীর ঘরে। (ব্যঙ্গসূচক স্বরে) যাবে না ?

শিরো। দূর হ, দূর হ ! ব্যাটা পাষণ্ড।

উমেশ। এমন সুকৃতি তোর নেই যে সেথায় গে পঁহুছিবি—যা বেটা পরুতের পোলা।

[প্রস্থান।

(মিষ্টার মুখার্জী, নবীন বাবু, বিষ্ণু বাবু, মিস গুপ্তা ও সার দীনেন্দ্র দয়ালের প্রবেশ)

মিঃ-গুপ্ত। আমি England, Scotland, Ireland, France, Germany, Denmark, Portugal, Spain, Italy, প্রতি দেশে, প্রতি জনপদে, প্রতি ঘরে, প্রতি দোরে, প্রতি গাছতলায়, প্রতি সরায়ে গিয়ে গিয়ে, India'র কথা, India'র কঠোর দুঃখের কথা, India'র poverty'র কথা India'র poor nationality'র কথা, agitate কত্তে পারি, provided Bistoo accompanies me in my tour.

মিঃ-মুখা। Thank you—India ought to be proud of a daughter of your stamp. (দীনেন্দ্রদয়ালের প্রতি) আপনাকে ধন্যবাদ—আমাদের দেশের বড়লোকগণ—The Rothschildes of our land, I regret to observe, gentlemen, sleep over the fate of India—India the mother of the *Kauravas* and the *Pandavas*, India, the mother of *Sankhya* and *Patanjala*, India, the mother of *Hanumana*, who, with his heroic achievements, beat down Bonaparte and the Duke of Wellington. (Hear, Hear,.)

নবীন। (দীনেন্দ্র দয়ালের প্রতি) সেই শুভের সখা, সচ্চিদানন্দ, আপনার মঙ্গল করুন। আপনি দেশের গৌরব, ভারতের গৌরব, এবং আমি অকুতোভয়ে বলিতে পারি, India'র গৌরব। (applause)

দীনেন্দ্র। আমি অতি সামান্য ব্যক্তি। আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে আপনাদের অন্তর্ভুক্ত ব'লে গণনা করেন আমার সৌভাগ্য।

বিষ্ণু। আপনি বিনয়ের অবতার, অবশ্য যে অবতার অর্থে incarnation আমি তার কথা বলছি না, সে অবতার আমরা স্বীকার করি না।

মিঃ-গুপ্ত। এবার Lady delegate কজন ?

মিঃ মুখা। আপনাকে নিয়ে altogether ৭ জন।

মিঃ-গুপ্ত। আমি এবার conference এ যে paper পড়ব তার বিষয় এখন হ'তেই ভাবতে সুরু করেছি, and I have fixed upon a very pretty name for it. "Our old Vishwamitra, and the finances of India of our day." You never knew Bistoo that the venerable

ascetic Vishwamitra, among his many qualifications was a great financier of his time.

বিষ্ণু। তাত জানতেম না। আর বলতে কি, হিন্দুগণ বিশ্বামিত্রকে এক রকম এক চেটিয়া করায়, আমি তাঁর ওপর বিশেষ আস্থা রাখি নাই।

মি-গুপ্ত। You, good-for-nothing old boy, Vishwamitra, in theological questions, always displayed a bias towards Brahmoism.

মিঃ-মুখা। তবে আজ আর আপনাকে অধিকক্ষণ বিরক্ত করব না। 30th & 31st দুই দিনই conference মিটিং আপনার হলে হবে ঠিক রইল। আবার বলি আপনাকে ধন্যবাদ। On behalf of the executive committee of the conference. I tender my warmest thanks to you. Would every one of our big folks were as good as you are.

(উমেশের প্রবেশ)

উমেশ। (Mukerjeeকে দেখিয়া) একি বাবা! বেলা ১১টার সময় বাড়ীর ভেতর বহুরূপী কেন? সন্ধ্যাবেলা সেজে এস মানাবেও ভাল, পাবেও দুপয়সা।

দীন। উমেশ! বাড়ীর ভেতর যাও।

মিঃ-মুখা। who is this chap—Poor man! I pity him. He is evidently drunk—You should dissmiss such of your sircars, for what else he can be ?

উমেশ। আজ্ঞে না বাবা বহুরূপী, আমি ওঁর সরকার নাই, আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর সংসারে উনি বিনা বেতনে সরকারী করেন বটে।

মিস্-গুপ্তা। Bistoo! did I not see this fellow at your place the other morning ? For God's sake Sir Dinendra, drive him off.

উমেশ। ওঃ বাবা! কলকণ্ঠ যে। (মিস্‌গুপ্তকে দেখিয়া) আরে এস গো কতক্ষণ ?

মিস্-গুপ্ত। আমি এ ইতর জনের সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা করি না। আমি চল্লেম।

উমেশ। আরে বস, বস, তামাক খাও। ওরে বিবিসাহেবকে তামাক দে।

দীন। (বিরক্তির সহিত) উমেশ যাও যাও, অসভ্যতা করো না।

উমেশ। তোফা মেয়েমানুষ! তুমি জান না বাবা! ও যখন আড় নয়নে ইংরিজী কয়, তখন আমার Dignam সাহেবের সেই মুসলমানী আয়াকে মনে পড়ে। বেড়ে জিনিষ!

দীন। মধো! ওরে মধো!

(মধোর প্রবেশ)

মধো। আজ্ঞে।

দীন। উমেশ বাবুকে বাড়ীর ভেতর নেযা।

নবীন। তুমি মুখ সামালিয়ে কথা কয়ো, স্ত্রীলোকের অপমান আমরা কখনই সহ্য ক'রব না।

মধো। মামা বাবু চলে এস, চ'লে এস, বাবুদের মেয়েমানুষদের ওপর তোমার নজর কেন?

উমেশ। (নবীনের প্রতি) জানকীর উদ্ধারের সময় মুখটাত পুড়িয়েছিলে, এঁর উদ্ধার ক'রে কোন খানটা পোড়াবে বাবা? মেয়ে মানুষ। মনে রেখো ভাই।

[উমেশকে লইয়া মধোর প্রস্থান।

দীন। আপনারা আমায় ক্ষমা করুন। উমেশ বাবু স্বভাবতঃ বড় ভদ্র, and I can assure you, he is an educated man। তবে ওঁর vice হচ্ছে drinking, উনি এমন সময় এখানে আসবেন আমি জানতে পারিনি, জানতে পারলে ওঁকে কখনই আসতে দিতাম না।

মিস্-গুপ্ত। Never mind—never mind উনি ওঁর কাজের জন্য তবে এখন দায়ী নন।

দীন। তা ত বটেই। আর এক কথা ওঁর সহজ অবস্থায় ওঁর সঙ্গে আলাপ কল্লে বুঝতে পারেন, He is a well—read man, and himself a great thinker, তবে একটু cynical। আমি ওঁকে এবং ওঁর opinions (যা আমার সঙ্গে মেলে) বড় শ্রদ্ধা করি।

মিঃ-গুপ্ত। বটে—বটে। একদিন তবে ওঁর সঙ্গে আলাপ করা যাবে। It is a great pity, this demon of wine is devouring a good many of our good men Well, we will disperse now—good-bye.

সকলে। Good-bye.

দীন। Good-bye—Good-bye.

[সকলের প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য

পানের দোকান।

(পানওয়ালা—পানওয়ালী।)

গীত

সহরের পায়ে নমস্কার!!
বিশেষতঃ সোনাগাজী টিরেটা বাজার।
টিরেটা সুঁটকী মাছের হাট,
বাপ্ লোকের কি জমাট—
যার গন্ধে পেটের নাড়ী ওঠে তাইতে মনের আঁট?
বলিহারি সুঁটকিখেকোয়, বলিহারি নোলায় তার!!
রুই কাতলার গলায় দড়ি যখন হাজা শুকো নেই বিচার!!
সোনাগাজী বাজার পিরীতের,
পিরীত টাকা টাকা সের—
যত শুকো চিমসী রুখো আম্‌সী ভাপনাতে জাহের;
তবু গাড়ী জুড়ী ভুঁড়ির বহর দিনে রাতে ঠেলাভার—
কমল মরে মধু বয়ে, খড় কাটে ভ্রমরার সার!!
দুটো মিঠে খিলি খাও,
মুখে রস করে নেযাও,
রোজত ছোট মরুভূমে রস কি সেথা পাও?
তাজা পাতায় ভাঁজা দোনা, ওপর সরু নীচে সার—
ফাঁপা হয় নিওনা, টেপো ভেতরে মাল চমৎকার!!

[প্রস্থান।

(উমেশের প্রবেশ।)

উমেশ। মহা এক গুণ বিধাতার,
দিনে দেছে আলো, রেতে দেছে অন্ধকার।
এযে কত বড় বাহাদুরী, কত বড় কারিকুরী,
মাথায় তা আসে কজনার?
দিনের আলো দুচক্ষের বিষ,

কেবল ভদ্দর হও, মেগে জুগে কথা কও,
তাও জোরে নয় শুধু ফিস্ ফিস্ ফিস্।
রাত বেঁচে থাক,
যত পার কর ডাক হাঁক,
সারাটা দুনিয়া যেন ফাঁক,
সাহা বংশ সুখে রোক, লাগাও দুচার ঢোক,
তার প্রাণ, তর মন, বিছাও মজলিস্,
নয় নিরামিষ,
নিদেন একটা miss
A couple for a kiss
টারা-রা-রা-বুম-ডি-এ, oh night oh bliss
রাত কি মজার চিজ এক ভয় পুলিস !!
শুধু বোতল পানে চাও
দুনিয়া ভুলে যাও,
নিএস কাঁকড়ার দাঁড়া, আধভাজা ইলিস্ ॥
রাত কি মজার চিজ,—এক ভয় পুলিস্ ! !

আমার শালিটার হাওয়া আমার গায়ে লেগেছে দেখছি। গল্ গল্ করে মুখ দে poetry বেরুচ্চে। আমার শালীর poetry লেখার গুঁতোয় পাড়ার লোক তেষ্ঠান ভার। আহা বেচারা রমানাথের কি অবস্থা, ভাবলে জ্ঞান থাকে না। ঘরের মাগ যেন গিরীশ ঘোষ—কথায় কথায় "নাহি জানি ভাইরে লক্ষণ"। গেছি আর কি। আমার বোধ হয় যত রকম হতভাগা দুনিয়ায় বিরাজ করেন, তার ভেতর পয়লা নম্বর হচ্চে, poetry লেখা মাগের ভাতার !! ইরি মধ্যে বাড়ী যাব? শালারা বলে, আমি misanthrope কেন হয়েছি। বোঝেনা, বিনি পয়সায় philanthropy exercise করার আদোতে সুবিধে হয় না। দেখি।

(প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য

পিয়ারার ঘর।

(গাঙ্গুলী ও ইয়ারগণ।)

গাঙ্গুলী। অনেক দিনের পর এ কাজ হ'ল। বাবা নেশার রাজা হল "গুলি"। ছোটলোক পাঁচ বেটায়, এমন নবাবী নেশাটার বিরুদ্ধে পাঁচ কথা বলে বইত নয়। তোমাদের ছেলেরা রাজা হোক্ অনেক দিনের পর এ কাজ করালে। এ নতুন দলে ঢুকে পর্য্যন্ত এ কাজের সুবিধে হয়নি।

প্র-ই। কেমন বাবা, বল। পেরিছি কি না?

গাঙ্গুলী। পারবে না বাবা? তুমি মানুষ, আরও মানুষ আছে? তোমায় চেনে কে? তোমাদের দলের মানুষ সব আজ কাল বড় বিরল হয়ে পড়ছে। হায় রে সেকাল! তোমাদের বলব কি বাবা, আমার খাস নিবাস হচ্চে গোড়ের কাছে বোড়াল ব'লে গ্রামে। এমন রাজধানী জায়গা আর হয় না। ছেলে বেলা মনে আছে, তেলিদের তিনে, আমি বোক্ষমদের দৌত্তুর এর এক এক জন, এক একটা ঐরেবত ছিলুম। বলব কি বাবা হাতি নইলে চড়িনি, নাতি নইলে মারিনি, ভাণ্ডার নইলে লুটিনি, বন্দুক নইলে ছুঁড়িনি।

দ্বি-ই। তা'ত বটেই, সেকাল এক দিন গিয়েছে। তখন সব ছেল আমিরী।

প্র-ই। আচ্ছা বাবা, অই যে বন্দুকের কথাটা ব'ল্লে, অইটেয় আমার বড় গোল দাঁড়ায়! ও বন্দুকই বা কি, আর পিস্তলই বা কি।

গাঙ্গুলী। ও দুই একই। পিস্তল বড় হলেই বন্দুকে দাঁড়ায়। ছেলে বেলায় বলে পিস্তল, চল্লিশ পঞ্চাশে বন্দুক, আর সত্তর আশিতে হ'ন কামান।

দ্বি-ই। দূর কর, ও গোঁয়ার-গোবিন্দ অস্ত্র শস্ত্র গুলোর নাম করো না বাবা! গায়ে কাঁটা দে ওঠে। (তৃতীয় ইয়ারের প্রতি) তুমি একটা হরিনাম কর। বাবা, তোমার সেই "মানভঞ্জনের" পালাটা একবার গেয়ে দাও। অনেক দিন শুনি নি। (প্রথম ইয়ারের প্রতি) তুই শুনিসনি, আহা যেন দাশুরায়ের কথা! শুনে চক্ষে জল রাখতে পারবিনি।

প্র-ই। গেয়ে দাও বাবা! যে বাঁচে যে মরে।

তৃ-ই। সে যে অনেকদিন গাইনি।

দ্বি-ই। তা হোক, লাগাও।

তৃ-ই। আচ্ছা, গুরুপদে প্রণাম করে লাগাই তবে তোমরা পোঁ ধরো।

ইয়ারদ্বয়। বেশ বেশ পোঁ ধরব এর আর বিচিত্র কি?

তু-ই। "একদিন রাত দুপুরে, কৃষ্ণচন্দ্র ফিরে ঘুরে,
শ্রীমতীর কুঞ্জে উপনীত।

ইয়ারদ্বয়। কুঞ্জে উপনীত ॥

তু-ই। আগড় দেওয়া কুঞ্জের দোরে, ডাকেন হরি কাতর স্বরে,
কিশোরি! ঝাঁপ খোল গো ত্বরিত।

ইয়ারদ্বয়। কিশোরি ঝাঁপ খোলগো ত্বরিত ॥

তু-ই। শ্রীহরির ডাকাই সার, প্যারি কল্লেন Don't care,
শীতে কৃষ্ণ কাঁপেন দুরু দুরু।

ইয়ারদ্বয়। শীতে কৃষ্ণ কাঁপেন দুরু দুরু ॥

তু-ই। পিরীতে পেট ফেঁপেছে হায়, গুড়ুকের বেয়াড়া তায়,
হ'ল বাছার হাত পা খ্যাচার সুরু।

ইয়ারদ্বয়। হাত পা খ্যাচার সুরু!

তু-ই। বড় বিপদ! ডাকা, হাঁকা, ফাঁকা, শাঁখা, আঁকা, সবই হ'ল, কিন্তু আগোড় খুল্লো না। তখন শ্রীহরি বড় কাতর! শুধু কাতর কেন, কাতর, অকাতর, সকাতর, আতর মায় ম্যাতর পর্য্যন্ত। ফেরেন—এমন সময় বৃন্দে দূতী উপস্থিত। রাধা-শ্যামের প্রেমের হাটের সদর মেট শ্রীমতী বৃন্দে দূতী, তখন এসে, মুচকে হেসে দুবার কেসে, বাঁয়ে ঠেসে, ঈষৎ গা ঘেঁসে, ভালবেসে, ধরে কেশে, বল্লেন সর্বনেশে,

"তোরেত রাই চায়নাকো হে।"

ইয়ারদ্বয়। (হরি হরি) চায়নাকো হে!

তু-ই। ওরে ও শ্রীনন্দের বলদ,
তোরেত রাই চায়নাকো হে।

ইয়ারদ্বয়। চায়না কো হে।

তু-ই। রাই চেয়ে চেয়ে চোক বুজেছে
এখনত আর চায়নাকো হে।

ইয়ারদ্বয়। এখনত আর চায়না কো হে।

তু-ই। রাইয়ের চাইতে গেলে মাথা ধরে,
এখনত রাই চায়নাকো হে।

তু-ই। "এদিকে শ্রীমতী মনে করে ব'সে আছেন। কেবল মান নয়—মান, অভিমান, অপমান, কম্পমান, চেয়ারমান, জাম্পান, রোমান, বেইমান, কামান,

প্রভৃতি যত রকম মান আছে সব করে বসে আছেন। ঠাকুর দেখেই একেবারে বিরস,—বিরস, সরস, নীরস, আদিরস, আনারস, মায় চরোস পর্য্যন্ত। সভয়ে বল্লেন, মা ঠাকুরুণ! কাষ্ঠ ত্যাগ করুন। মাঠাকরুণ একেবারে আগুন—শুধু আগুন নয়, মনাগুন, বেড়াগুন, কাঁথাগুন, নৌকাগুন, শেষ বেগুন, তখনও নেবেন না। রেগে বল্লেন, রে বর্ব্বর! রে শর্করা-তর্কিত-তুর্কিস্থান! রে ভেকনিকর-কর-কর-তারকা-করঙ্কিত! রে চীনেবাজার! হিন্দু হোটেল! জীবিতেশ্বর। ফের যদি আগুন চাইবি ত যুদ্ধ করব। এদিকে বৃন্দে দূতী অবকাশ পেয়ে ঝিমুচ্ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটু নিদ্রাও চলছিল, শুধু নিদ্রা কেন, নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়ং, ক্রোধঃ, আলস্যং, দীর্ঘসূত্রতা, সবই চলছিল, শ্রীমতীর চেঁচানিতে জেগে একেবারে যুদ্ধং দেহি। ঠাকুর বেগতিক বুঝে একটী লাফ দিলেন, শ্রীমতীর কুঞ্জে থেকে একেবারে কালীঘাটের নাট মন্দির, বড় সিধে লাফ নয়। এসেই শুন্‌লেন মাইকেল মেঘনাদ বধ করেছে, যাঁহাতোক শোনা, অমনি হালদারদের ডেকে কেঁদে বল্লেন।

কি কহিলে দূতবর। কাঁতায় আগুন
হইলরে এতদিনে? শীঘ্র করি দুধ,
আন্দাজ আধসের আন, খাইয়া মরিব আমি।

(পিয়ারার প্রবেশ)

ও বাবা—শ্রীমতী যে সুমুখে, আমি নই আমরা শ্রীদাম, সুদাম বই নই বাবা—আমাদের মেরো না—ঠাকুর পরে আসবেন—

[প্রস্থান।

পিয়ারা। কোথায় তোমার ঠাকুর—রাত যে দশটা বাজে।

গাঙ্গুলী। ও পিয়ারা বিবি (ইয়ারদ্বয়ের প্রতি) উঠে পড় ভাই, চোখ মোছ, আমরা পিয়ারার ঘরে।

ইয়ারদ্বয়। (চক্ষু মুছিয়া) দুর্গা—দুর্গা, বড় মোশা, তামাক ডাক বাবা।

পিয়ারা। বিদিশী! তামাক দে।

গাঙ্গুলী। দেখ দেখি সিড়িতে, কার পায়ের শব্দ হ'চ্চে না! দশটা বাজে যখন, তখন তাঁর আসবার সময়ত হ'য়ে গেছে।

পিয়ারা। তিনি চিনে আস্‌তে পারবেন?

গাঙ্গুলী। সে সব ঠিক করে রেখে এসেছি। নে আসবার লোক আছে। অই যে শব্দ বেশী হচ্চে, তুমি একবার সিড়িটা পর্য্যন্ত এগিয়ে দেখ।

পিয়ারা। দেখি।

[পিয়ারার প্রস্থান।

গ্র-ই। বেয়ারাটা গেল কোথায়? দুপয়সার পান আনতে দিই।

গাঙ্গুলী। খুচরো পয়সা আছে?

গ্র-ই। টাকা ভাঙ্গাতে দিচ্চি।

গাঙ্গুলী। ও কাজটি কর' না। দুপয়সার জন্যেই দাও, আর দশ পয়সার জন্যেই দাও, বাকী পয়সা এ জায়গায় ফেরত পাবে না; কেউ কখন পায়নি।

(বিষ্ণুকে লইয়া পিয়ারার প্রবেশ)

পিয়ারা। আজ না জানি কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, রোজ তার মুখ দেখে উঠব, রোজ তাহলে আপনাকে পাব।

বিষ্ণু। আপনি গাঙ্গুলিকে দিয়ে কি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

পিয়ারা। বলছি। আপনি বসুন! একদিন না, এমন অনেক দিন ডেকে পাঠিয়েছি, আপনি আসেন নি।

বিষ্ণু। আসতে পারিনি। নানান ঝঞ্ঝাটে থাকতে হয়।

গাঙ্গুলী। বাবু, বসুন। বড় শোভা হয়েছে। যেমন আমার পিয়ারা দিদির রূপ, বাবুরও তেম্নি। (ইয়ারগণের প্রতি) এস ভাই সকল আমরা ও ঘরে গিয়ে বসি, এখানে বাবুর সঙ্গে পিয়ারা দিদিকে গোপনে অনেক ধর্ম্মকথা কইতে হবে।

হি-ই। বেশ বেশ।

[গাঙ্গুলীর ও ইয়ারদ্বয়ের প্রস্থান।

বিষ্ণু। গাঙ্গুলী!

গাঙ্গুলী। আজ্ঞে—

(গাঙ্গুলীর পুনঃ প্রবেশ)

বিষ্ণু। কোথা যাচ্চ? তুমি এইখানে থাক না। ও দুটী লোক কে?

গাঙ্গুলী। ওরা কেউ নয়। আপনি বসুন না, আমি আসচি। (পিয়ারার প্রতি জনান্তিকে) দিদি! সুবিধে করে নাও না গো!

[প্রস্থান।

বিষ্ণু। আপনি কি আমাদের সম্প্রদায়ে আসতে ইচ্ছে করেন?

পিয়ারা। আপনি পায়ে রাখেন ত, সব কর্ত্তে পারি।

বিষ্ণু। তা হ'লে আপনাকে এ কুৎসিত ব্যবসা পরিত্যাগ কত্তে হবে।

পি। নেহাত।—চেষ্টা করব—(হাস্য)

(বেগে মিসগুপ্তার প্রবেশ, পশ্চাতে কম্পমান গাঙ্গুলি।)

মিস্-গুপ্ত। You are a Blackguard—I know it—Bistoo! তোমার এই কাজ—এই তোমার আমার সঙ্গে engagement রাখা? বেশ—

বিষ্ণু। গাঙ্গুলী—

গাঙ্গুলী। মশায়! আমি আসতে দিইনি। জোর করে এলেন। মেয়ে-মানুষের এমন হাড় শক্ত, আমি কখন দেখিনি, এক ঘুসিতে আমার রগে কাল সিটে পড়িয়ে দিয়েছেন—

মিস্ গুপ্ত। (গাঙ্গুলীর প্রতি) You are the root of all evils. তোমাদের মত লোক ভদ্র সন্তানদের মাথা খায়—বিষ্ণুর দোষ কি?

গাঙ্গুলী। আজ্ঞে—উনি ত কচি ছেলে গো—ন্যাংট হ'য়ে খেলা করেন। আমিই যার ভুলিয়ে ভালিয়ে কোমরের বোর ছড়াটী কুলে নে এয়েছি।

(গান করিতে করিতে নাপ্তিনীর প্রবেশ)

বলি শোন ধনি,
এখনও তোর ব্যাম সারেনি।
এখনও মুখ ফুলো ফুলো, ফ্যাল ফেলে চাউনি।
এখনও তোর গা করে টল টল,
যেন নাইক দেহে বল,
এখনও তোর টকের নামে নোলায় আসে জল,
এখনও সামাল সামাল, অসামালের ভয় ঘোচেনি।

পিয়ারা। নাপ্তিনি! ব্যাম সেরেছিল ভাই, আবার দোয়ারে পড়েছি

নাপ্তিনি। তাত পড়বেই, তোমার ভাই বড্ড নোলা।

গাঙ্গুলী। (বিষ্ণুর প্রতি জনান্তিকে) ভয় কি মশাই, তা উনি এয়েছেন এয়েছেনই, তাতে ভয়টা কি? আপনি অত মুখ শুকুচ্চেন কেন? পিয়ারা দিদির ব্যায়রাটাই সর্ব্বনাশ করেছে। সে আপনার চাকরকে এ বাড়ীর নম্বর বলে এসেছেল—আপনার চাকর সে ভুনোওয়ালা বইত নয়, তার আর বুদ্ধি শুদ্ধি কি হবে বলুন—ফুলুরি দিদিকে এখানকার ঠিকানা বলে দিয়েছে, উনিও সশরীরে তাই এখানে উপস্থিত। তা আপনার তাতে কি? চিরকাল যে ফুলুরি দিদিকে যত্ন ক'ত্তে হবে, তারই বা মানে কি? আর ওঁর

তবু বিদ্যা বুদ্ধি আছে, খুঁটে খেকো, এ গরিবের কে আছে বলুন দেখি :

বিষ্ণু। (গাঙ্গুলীর প্রতি জনান্তিকে) পাগলামী কোরোনা থাম। এখান থেকে শিগ্‌গির বেরোবার বন্দোবস্ত কর। তুমিই সর্ব্বনাশের মূল।

গাঙ্গুলী। বটে—বেশ। "যার জন্যে চুরী করি সেই বলে চোর।"

নাপ্তিনি। (মিস গুপ্তকে দেখাইয়া) পিয়ারা দিদি! ইনি কে ভাই—এঁকে ত কখন দেখিনি—নতুন না? ওঃ বুঝেছি, ঐ বামা বাড়ী-উলির ঘর নিয়েছেন বুঝি? (মিসগুপ্তের প্রতি) বেশ-বেশ—তা তুমি ভাই, একেবারে মেম সাজলে আমাদের ত চলবে না—আমি কাল তোমার ওখানে যাব—তোমার যুতো খুলে তোমায় আলতা পরাব।

গীত।

ওলো, বড় সুখের পেশা আমাদের মরি।
আমরা চাঁদ ধরে পায় আলতা পরাই,
গোলাপ ফুলে রং করি।
এমন হামেশা পাই পা,
আলতা কাঁদে পায়ের রঙে,
(আমার) লাজে কথা সরে না—
যোগী যোগ ভুলে যায়, যে পায়ের দার,
সে পায় ঝামা ঘসে টিপ ধরি!!

নাপ্তিনী। সাহেবের মেয়েদের কুটে পা, তাই বুটে ঢাকে তোরা কেন ঢাকিস ভাই।

মিস্ গুপ্ত। Who is this She devil? তুই কে?

নাপ্তিনী। ও বাবা এ কে গো? এর যে কাপ্তিনি সাহেবের মত কথা বার্ত্তা। ও রকম ধাত হলে এ লাইনেত সুবিধে কত্তে পার্ব্বে না বাবু। এখনকার বাবুরা সভ্য ভব্য চায়। পিয়ারা চল্লুম ভাই।

[প্রস্থান।

মিস্ গুপ্ত। তোমার এই নরকে প্রবেশ ক'ত্তে ঘৃণা বোধ হল না?

বিষ্ণু। ইনি আমাদের সম্প্রদায় অবলম্বন করবেন স্থির করেছেন, তাই সেই বিষয়ে একটা ঠিক ঠিকানা কত্তে এসেছি।

পিয়ারা। বলি হ্যাগা, ও স্বর্গের বিদ্যাধরি! এ হল নরক, আর তোমার ঘর হল

একেবারে বিশ্বেশ্বরের মন্দির, না?

মিস্ গুপ্ত। আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি না, কথা কহিতে ইচ্ছাও করি না। বরং ঘৃণা বোধ করি, তুমি স্থির হও।

পিয়ারা। বলি, আমিই কি তোমার সহিত কথা কহিতে আহ্লাদে এলিয়ে পড়ি, তা নয়। না বলেও বাঁচি না, নিজের লোককে নিজে সাপ্টাতে পার না, পরের সঙ্গে ঝগড়া করে মর কেন? ঘৃণা করিতে লজ্জা হয় না, আমিত আর আমার বাবুকে ধত্তে তোমার ঘরে যাই নি, তোমাকেই আমার ঘরে আসতে হয়েছে।

মিস্ গুপ্ত। তুমি মুখ সামালিয়ে কথা কও, আমাকে কুৎসিত বেশ্যা মনে করিও না।

পিয়ারা। বেশ্যার বাবা মনে করব। আমরা গোঁফ দেখে বেরাল চিনি, দেখেই চিনিছি তুমি কি? তোমাদের জন্যেইত আমাদের দুর্গতি। লোকে আপাততঃ নিখরচা ইয়ারকি পেলে কেন পয়সা খরচ করবে? আমাদের বৃত্তিকেত ঘৃণা ক'রে ফেল্লে, তোমাদের বৃত্তিটা একবার তলাও দেখি? আমরাত দিনে সাবিত্রী, রেতে গায়িত্রী সাজি না। আমরা যা তাই আছি, আমরা যা, আমরা জানি, সেই রকম চালে চলি। আমরা ভদ্রলোকেদের কাছে দু-পয়সার পিত্তেস করি, পরিবর্ত্তে তাদের দাসীবৃত্তি করে আপনাদের চরিতার্থ বিবেচনা করি। আমরা যা করি প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে কিছু করি না। আমরা যাদের সর্ব্বনাশ করি, তাদের সুমুখে যাই না, ভয়ে তফাতে থাকি, যথার্থ গেরস্থর মেয়েদের আমরা দেবতা ঠাওরাই, তাদের ছাওয়ায় প্রণাম করি, প্রার্থনা করি, যেন জন্ম জন্মান্তরেও সে রকম হ'তে পারি। আর তুমি কি? ব্যবসা, বাণিজ্য, চাল, চলন, সবই আমাদের নিয়েছ, কেবল একটু মুখস পরে আছ, ভদ্দর আনার। সেই মুখোসের জোরেই লোকের সর্ব্বনাশ কর, লোকে সেই মুখোসের প্রেমে পড়ে, ভাবে না, মুখোসের ভেতর যে সে আমাদের প্রপিতামহ। আমরা পেসাদারী যাত্রা, সাইনবোট আছে, দেখ, বায়না কর, কায করি। তুমি সকের যাত্রা, আমাদের মত মেহন্নত কর না, অথচ গুমোরে মাটিতে পা দাও না, বাড়ীওয়ালার কাছে আমাদের যত বায়না নাওনা বটে, কিন্তু গাড়ী ভাড়া, হালুয়া, মদে, আর, তোয়াজে, আমাদের হ'তে দশগুণ তার খরচ করাও। তুমি পেত্নী হ'য়ে ঘাড়ে চাপ, আবার রোজা সেজে ঝাড়াও, আমরা সেটা পারি না। আমরা বেহায়া, অশ্লীল, আমরা সব, কিন্তু

এখনও তবু তোমার মত একলা দুকুর রাত্রে বাবু ধ'ত্তে বেরুতে পারি না। আমাদের গা এখনও ছম ছম করে, তুমি সে অবস্থা কাটিয়ে গেছ। তুমি আবার এসেছ ঝগড়া কত্তে? আমি দু পয়সা তোমার হাওলাত দিচ্চি, বাড়ী যাবার সময়, এক গাছা দড়ি কিনে নে যেও—নে যেও—আমার মাথা খাও।

(উমেশের প্রবেশ)

[বিষ্ণু গাঙ্গুলী ও মিস্ গুপ্তের দৌড়িয়া প্রস্থান।

উমেশ। Hear, hear, পিয়ারা! তুই র'াড়েদের ভেতর জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন। ওরা পালাল কে বাবা?

"উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী; কিন্তু একে একে
শুকাইল ফুল এবে নিবিল দেউটি"

একটা কথা কও জাদু। কইবে না?

গীত

দোরসা মাছ বেচতে বসে,
মেছুনি তোর গুমোর কেনে?

পিয়ারা। এত রাত্রে কোত্থেকে মরতে এলে?

উমেশ। এখানে আমরা মরতে আসিনা বাবা, আগে আমরা মরি, তার পর এ প্রদেশে এসে পঁহুছই।

পিয়ারা। এতটাই যখন বুঝেছ, তখন হবিষ্যি সুরু কর না?

উমেশ। মনে কল্লুম তোর ঘরে চেঁচামিচি হচ্চে, পাঁচ বেটা আছে, একটু রংও চল্‌ছে, গিয়ে মিশে পড়ি। ব্যাটারা যেন ভট্টচার্য্যিদের বউ, একাদশীতে পর পুরুষের পানে চান না, আমি আসতেই যে যেদিকে পাল্লে পালাল। মদেরও তো সম্পর্ক নেই। তুই কি আজ কাল এই রকম রুক্ষ লোক রাখিস। দূর হোক এখানে সুবিধে নয়।

[প্রস্থান ও পরে পিয়ারার প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বিডন স্ট্রীট।

বাউলগণ।

গীত।

বেঁচে থাক বিধাতা পুরুষ, ধন্যি তার মুন্সুরী-আনা।
গড়েছে দুনিয়াটা ভাই কি মজাদার চিড়িয়াখানা॥
রেখেছে নানান জানোয়ার, গন্তি নাইক তার.
বাড়ার ভাগ শাখামৃগ. বল্লদ অবতার—
বুঝি গাধার নম্বর সব চেয়ে জোর
চীৎকারেতে যায় জানা॥
ও পাসে ছুঁচোর দল গরম,
নিজে নিজে ঠাউরে নরোত্তম,
পড়ে আঁস্তাকুড়ে ন্যাজ্ নাড়ে ভাই কালটা কি বিষম—
এত চারপেয়েদের মাঝে থেকে
আমাদের ভার জাত বাঁচানা॥

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ধর্ম্মতলা—মনুমেণ্ট সম্মুখস্থ ময়দান।

(সার দীনেন্দ্র দয়াল ও উমেশ)

দীনেন্দ্র। তা তুমি কি বল চুপটী ক'রে তোমার মত হাই তুলে সময়টা কাটাতে হবে? বেশ, তোমারি কথা ধল্লুম, আমাদের বাঙ্গালীর যেন অনেক কাজে একটু বাড়াবাড়ি, কিন্তু তুমি কি ঠাওরাও আমাদের সব কাজ একেবারে নিষ্ফল? এই সব সভা সমিতি, association এই যে Congress, এ সমস্তরই কি কিছুমাত্র ফল নাই? দেশের সমগ্র লোকটা জড় হয়ে যে একটা কাজ কচ্চে, সে কাজটা কিছুই নয়, তারা সব আহাম্মক, কেবল তুমি

শ্রীউমেশচন্দ্র, এবং তোমার দলের তোমার মত জনকয়েক উন্নতিশীল লোকই বুঝি বিদ্যাটার monopoly ক'রে বসে আছ?

উমেশ। দেখ দেশের সমগ্র লোক কাকে বল বলত? এই একটা বড় তারিফের ঢেউ উঠেছে, কথায় কথায় বলা হয় দেশের সমস্ত লোক, সমগ্র লোক। এত বড় ভারতবর্ষটা কি তুমি ঠাওরাও, জন দুচ্চার খপরের কাগজওয়ালা, দু একজন বিলেত ফেরত Native anglo-Indian, দুদশজন Title লোভী জমিদার, আর দশ বিশ জন আমা হতেও নিষ্কর্ম্মা হুজুক প্রিয় বাক্যসার লোকের সমষ্টি? এটা কি একবার ভাব, দেশের ১৪ আনা লোক, আমার বোধহয় আরো বেশী, মোটেই জানে না তোমরা কে, তোমরা কি কর। তারা গরীব, কষ্টে শ্রেষ্টে আপনাদের গ্রাসাচ্ছাদন আহরণ কত্তেই ব্যস্ত, তারা তোমাদের মত ফুলোল তেল মেখে স্নান করে, পোলাও খেয়ে উঠে, মখমলের বিছানায় টানা পাখার হাওয়ায় বসে, খপরের কাগজ পড়তে পায় না, আর তোমাদের মত they have not got more money than they know what to do with। তোমরা বিনা মাশুলে তাদের অগ্রণী হ'য়ে দেশের রাজার কাছে তাদের হ'য়ে বলে নিজেদের সুবিধে করে নিচ্চ। সে গরীবদের লাভ এই তোমাদের action এর জন্য তারা suffer কচ্চে?

দীনেন্দ্র। চুপ, চুপ, বড় serious কথা কচ্চ—সাবধান! মুখ্যুর মত হাউ হাউ কল্লে তর্ক করা হয় না। তাদের হ'য়ে আমাদের সুবিধে কচ্চি? দেশের দুটো লোকই বল, আর দশটাই বল, যারাই একটু public-spirited কি একটু politically inclined, এটা তোমায় স্বীকার কত্তে হবে, তাদের সকলেই, অন্ততঃ পক্ষে অধিকাংশ, আর কিছুতে না হোক, বিদ্যাবুদ্ধিতে ভারতবর্ষের গৌরব। তা জেনেও তুমি কি বলতে চাও তারা সকলেই এত Selfish, এত Mean, যে দেশের চোদ্দ আনা লোকের Porverty বা Ignoranceএর Advantage নিয়ে তারা নিজেদের Interest Advance কচ্চে। যা বলবে হিসেব করে বল, এলোমেলো চেঁচালে ভবানীপুরের হাসপাতালে থাকতে হয় জান?

উমেশ। বিদ্যা বুদ্ধি থাকলেই লোক জিতেন্দ্রিয় হয় না। দুনিয়ায় বাস করে নিস্বার্থপরতা practice করা, তুমি যতটা সোজা ঠাওরাও আমি ততটা ঠাওরাই না। যাইহ'ক, তোমার কথাই ধরে বলচি, তারা জেনে শুনে না

হ'ক, না জেনে শুনে যে দেশের চৌদ্দআনা লোকের অন্ততঃ পক্ষে উপকার অপেক্ষা অপকার বেশী ক'চ্চে এটা আমার বিশ্বাস, হ'তে পারে এ বিশ্বাস আমার ভুল। সারা ভারতের কথা ছেড়ে দাও, শুধু আমাদের জাতটার কথা ধর, বাঙ্গালী। জান আমাদের জাতটা কি দরিদ্র; আর এই দারিদ্র্য দিন দিন কি ভয়ানক বাড়চে? এই poverty'র শেষ কোথায় দাঁড়াবে তলিয়ে ভাব কি? এই যে ১৫ আনা বাঙ্গালী, হা চাকরী যো চাকরী ক'রে বেড়াচ্চে, চাকরী জুটলেও মন্বন্তর, ১৫ টাকায় গেরস্থের সংসার চলে না, না জুটলেও মন্বন্তর। আর চাকরীত জোটেই না। আচ্ছা একটা generation anticipate কর দেখি, ভাব দেখি এ poverty কি ভীষণতর দাঁড়িয়েছে, লোকে হা-হা কচ্চে, গলায় দড়ি দিচ্চে বিষ খাচ্চে, তার পর আর এক generation, কেমন আর picture কত্তে পার? ঠাওরাও দেখি, এ povertyর end কোথায় বা কি রকম? আমারত বোধ হয় বাঙ্গালী জাতের thorough extinction বই এ poverty হ'তে বাঙ্গালীর মুক্তির অন্য উপায় নেই। যা বলছিলেন, তুমি sir দীনেন্দ্রদয়াল, তোমার স্বর্গীয় ঠাকুরের কৃপায় ৪টি লক্ষ টাকা জমিদারীর মুনোফা ভোগ কচ্চ, একটী সভা কল্লে, পাঁচটা লেকচার দিলে, নিজের একখানি খপরের কাগজ আছে, দুটী District Magistrate-এর againstএ তাতে লিখলে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের চেয়ে more benign Government আর নেই,—হবে না, দোষ অনুসারে সে magistrate দুজনকে গবর্ণমেণ্ট দণ্ড দিলেন। তোমার সরল বিশ্বাস দাঁড়াল, দেশের একটা যথার্থ উপকার কল্লে, দুজন অত্যাচারী গোরার উৎপীড়ন হ'তে আপনার জাত ভাইকে বাঁচালে, জাতীয় স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা কল্লে। রাত্রে সুখে নিদ্রা গেলে। দাশরথী ভটচায্যির বাড়ী হাঁড়ি চড়ে না, তার চারদিক অন্ধকার, দুটী ছেলে মাথা ধরা হয়ে উঠেছে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অনেক সুপারিশের পর আজ বলেছেন, ভটচায্যির ছেলে দুটীকে তাঁর নিজের আপিসে হ'ক কি তাঁর কোন বন্ধু বান্ধবের আপিসেই হ'ক, বলে দেবেন। ভটচায্যিও সুখে সে রাত্রি নিদ্রা গেল। সকালে উঠে ভটচায্যি magistrate সাহেবকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ ক'ত্তে ক'ত্তে, তার ফটকে ঢুকতেই সাহেবের দরওয়ান বল্লে "নিকাল যাও।" কেন জান, তার আগের দিন, তোমার খপরের কাগজ দেখে গবর্ণমেণ্ট থানা-তল্লাসী করে, magistrate সাহেবের উপর censure pass করেছেন। তুমি চার লক্ষের

মালিক, তার মত ৪টা Magistrateকে চাকর রাখতে পার, সুতরাং Magistrate তোমার কি করবে বল? সে চটল বাঙ্গালী জাতের ওপর, আর সে চটার দরুণ ভুগতে সুরু কল্লে গরীবেরা। প্রথম ভুগলে গরীব দাশরথী ভটচায্যি। হয়ত নিরাশায় ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা কল্লে। এই থেকে deduce করে নাও, কেমন করে তোমরা জেনেই হ'ক, না জেনেই হ'ক, দেশের জনসাধারণের উপকার অপেক্ষা অপকার বেশী ক'চ্চ।

দীন। হতে পারে, কিন্তু আমি যে কাগজে লিখলুম, কেন? সে গোরা দুজন অত্যাচারী, কোন না কোন জুলুম করেছিল বলেইত। অন্যপক্ষে, তারা আমার লেখার দরুণ ভবিষ্যতে সাবধান হ'য়ে কাজ ক'রবে। অত্যাচারীর জুলুম হতে গরীব প্রজা রক্ষা পাবে।

উমেশ। বটে, কিন্তু তোমরা কি তিলকে তাল করনা? মুখে যাই বল, তোমাদের ভেতর সত্য সত্য কি moderation of tone, sobriety of judgement এখন ও এসে পঁহুচেছে? তুমি সাধু জমীদার, তোমার তালুকে জাহির কল্লে —তোমার চক্ষে সকলে সমান, প্রজারা তোমার পুত্রের স্থানীয়। শুনেই বসরুদ্দি মণ্ডল, যে তোমার ছেলেকে কি তোমার বাড়ীর কোন লোককে, কি তোমার কর্ম্মচারীদের, দেখলে আগে ভুঁই ছুঁয়ে সেলাম কত্ত, তোমার সদর নায়েবকে তুমি আমি ব'লে কথা কইতে লাগল। যত উদার প্রকৃতি হোক, সে ভাবটা তোমার কর্ম্মচারীর, অথবা তোমার নিজের ভাল লাগবে কি? এই যে ইংরেজ জাত, সাত সুমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এসে, এখানে কত কষ্টে, কত মরে, কত মেরে, রাজত্বটী গুছিয়ে বসেছে। এরা কি তার দরুণ তোমাদের আর তাদের ভেতর সম্মানে, সঙ্গতিতে, সবেতেই, একটা পার্থক্য রাখতে আশা করে না? রাজা প্রজা, কথা দুটোতেই এক সমুদ্দুর তফাত যে। এক আফিষে তুমিও কর্ম্ম কর, একজন সাহেবও কর্ম্ম করে। তুমি ৩০০৲ টাকা মাইনে পাও, সে ১০০৲ টাকা পায়। একেবারে তুমি তার কাছে মনিবানী চাল ধ'ল্লে। সেকালে হাজার টাকা মাইনের দাওয়ান জাহাজী গোরাকে মাটী ছুঁয়ে সেলাম কত্ত। দাঁড়িয়েছে এই, সেকেলে সাহেবেরা বাঙ্গালীদের যথার্থ ভালবাসত, যথার্থ আদর কত্ত, বাঙ্গালীদের নীচু দেখত তাই বাঙ্গালীর উপকার ক'ত্তে ব্যস্ত হ'ত, এখনকার সাহেবেরা বাঙ্গালীদের upstart ভাবে, বাঙ্গালীদের ওপর হাড়ে চটা, বাঙ্গালী এখন সাহেবদের চক্ষের শূল। তখন এত association ছেল না, খপরের কাগজ ছেল না, fiery editors ছেল না, কিন্তু

ইংরেজ রাজত্বে বাঙ্গালী যথার্থ সুষ্ঠ ছেল। এখন association, meeting, lecture, newspaper, congress, সাম্য, স্বাধীনতা, কিন্তু বাঙ্গালী ইংরেজের প্রসাদ হারিয়ে, দুরবস্থার এক শেষ।

দীনেন্দ্র। আমাদের সকলের চেষ্টাওত তাই, এই congress-এর প্রধান উদ্দেশ্যইত তাই, বাঙ্গালীর ওপর ইংরাজের বিদ্বেষ ভাব দূর করা, to heal up the wound। আমরা যে প্রাণপণ করেছি, কেন?

উমেশ। বাবা, কেউ প্রাণপণ করনি। সব নিজের নিজের উদ্দেশ্যে ঘুচ্চ। কেউবা নামের জন্যে, কেউবা ভড়ং-এর হ্যাঁপানি, কেউবা শুধু হুজুগে, কেউবা উরির ভেতর থেকে দুপয়সা টানবার পিত্তেসে।একপ্রাণ বা প্রাণপণ কথাটার অর্থগুলি সিদে নয় ভাই। তোমাদের courage of conviction কই যে তোমরা কোন কাজে প্রাণপণ করবে? সঙ্কল্পে sincerity কই? যতদিন সেটা না হ'চ্চে আর গোঁড়ামী যতদিন না দেশ থেকে উঠছে, ততদিন কিছু হচ্চে না বাবা, কিছু হচ্চে না। আচ্ছা তুমি একটা মজা দেখতে চাও?

দীনেন্দ্র। ঢের মজা দেখিয়েছ। ৪ গণ্ডা পয়সায় যে বাঁদর নাচ দেখায় সে আর নতুন মজা দেখাবে কি?

উমেশ। শোন বলি, ঠাট্টা ক'রো না। আমি জীবনে একটী মাত্র সাধু পুরুষকে পেয়েছিলেম। যথাসাধ্য সে সময় তাঁর সেবা শুশ্রূষা করেছিলাম। সম্প্রতি আজ কয়েক দিন হ'ল, তিনি তাঁর এক শিষ্যের মারফাত আমাকে একটা অমূল্য রত্ন পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন একটী বস্তু, তার গুণ মানুষের গুণ পরীক্ষা। যেমন কষ্টিপাথরের স্পর্শে সোণার জাত নির্ণীত হয়, তেমনি এ বস্তুর স্পর্শে মানুষের মন নির্ণীত হয়, অর্থাৎ সেই বস্তুটীর সংস্পর্শে এলে মানুষ, না জেনে, সহজ অবস্থায়, স্বাভাবিক ভাবে, মনের নিগূঢ় কথা সকল ব'লে ফেলে। আচ্ছা তোমার বাড়ীতেত মিটিং হ'বে—বাইরের হলের রাউণ্ড Tableএ ঠেকিয়ে আমি সেই বস্তুটী রেখে দোব, আর chairগুলি সেই টেবিলে ঠেকিয়ে রাখব। সভ্য মহাশয়দের Drawing roomএ প্রথম বসিয়ে, একে একে Hallএ আনান যাবে, আর সেই chairএ বসান যাবে। কেমন রাজি?

দীনেন্দ্র। আজ কাল কি শুকনো নেশা সুরু ক'রেছ?

উমেশ। বেশত ভাই, না হয় নাই হল, তাতেত আর কিছু আসবে যাবে না, কেউ কিছু বুঝতেও পার্ব্বে না। তিনি যে লোক মারফাত অত যত্নে বস্তুটা

পাঠালেন, সেটা সত্য কি মিথ্যা তার গুণটারতো পরীক্ষা হবে।

দীনেন্দ্র। দেখা যাবে এখন চল।

উমেশ। আর আমার একটী অনুরোধ আছে, বোনাই বাবু।

দীনেন্দ্র। কি অনুরোধ।

উমেশ। ভারী অনুরোধ, কত ভারী বুঝে দেখ, চার দিকদে লোক চলচে, আর আমি চেঁচিয়ে তোমায় বোনাইবাবু বলছি। আমার ভগ্নীর দিব্বি, এ অনুরোধটী তোমায় রাখতে হবে।

দীনেন্দ্র। বল শুনি আগে।

উমেশ। অই চসমাউলি মেয়েমানুষটাকে দিন কতকের মত আমায় দিতে হবে। দোহাই তোমার, তোমাদের patriotএর দল রাজা হোক।

দীনেন্দ্র। আমি তোমাকে prosecute করাতে পারি জান, for insinuating against a lady's character.

উমেশ। দু দশ দিনে আর characterএর কি এসে যাবে? দেবে না? যাও মনটা বিগড়ে দিলে, বাবা। অনেকটা ভরসা ও বিষয়ে তোমার ওপর রেখেছিলুম। তুমি যাও, আমি একবার সেন কোম্পানির দোকানদে ঘুরে যাব।

দীনেন্দ্র। এখন আবার কেনা বেচার কি দরকার হল?

উমেশ। পুরোনো জরের পাঁচন দুমোড়া কিনে নে যাব।

[একদিক দিয়া উমেশের এবং অন্যদিক দিয়া Sir. দীনেন্দ্র দয়ালের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ।

বহুরূপীগণ।

আমরা আর্য্যবংশ-অবতংশ, বহুরূপী ধুরন্ধর।
বেড়াই নানা ভাবে নিরন্তর।
কভু হরি হরি বলে, ভাসি আঁখির জলে,
যীশুপদতলে কভু লুটাই—
কভু মহম্মদে মজি (ভাইরে), কাছা খুলে ভজি,
কভু নিরাকার করি গোচর !!

কভু ঘোষপাড়াতে যাই, কি মজা ওড়াই,
বিশ্বেশ্বর ঠাঁই, কখনও সার—
কভু কৌপীন বসন (ভাইরে), কভু পেণ্টুলন,
মিহি শান্তিপুরে কখনও ভর !!
কভু শ্যাম্পেন, সেরী, রম, থিসিলব্লেণ্ড, ওল্ড টম,
হুইস্কি ব্রাণ্ডি বিয়ার বাঁচায় প্রাণ—
কভু টেম্পারেন্স-রত, (ভাইরে) বক্তৃতা বিব্রত,
ভারত জাগাতে কভু কাতর !!
কভু ডাক, সারস, হাঁস, খাই মুরগীরাশ,
টিকটিকী আরসোলা বাছি না—
কভু আঁস দূরে রাখি, (ভাইরে), নিরামিষে থাকি
পিঁপড়ে ছুঁলে নেয়ে খাই গোবর !!
কভু, ফিমেল ইম্যান্সিপেশ্যান, অহর্নিশি ধ্যান,
শুধু এক্সেপশ্যান, আপন ঘর—
কভু লেভির মসনদে (ভাইরে), কখনও হাজতে
ভ্রমি নানামতে, ধরণীপর !!

———

তৃতীয় দৃশ্য

রমানাথ বাবুর অন্দর।

রমানাথ ও উমেশ।

রমা। তবে দাদা যে দিন Sir দীনেন্দ্রদয়ালের বাড়ীতে যে conversazione হয়েছিল, তাতে যোগ দিয়েছিলে?

উমেশ। না ভাই এতটা আহাম্মক আমাকে ঠাওরাচ্চো কেন? Time-এর Suicidal আমি দেখতে পারি না।

রমা। বটে এত কাযে ব্যস্ত?

উমেশ। ২৪ ঘণ্টা ব্যস্ত। conversation যদি কখন করে থাকি, মেয়েমানুষ নিয়ে। বিষয় কর্ম্ম মাতলামী জানত, তাতে এক মিনিট নিখেষ ফেলবার

অবকাশ নেই। জীবনে একবার একটী দিন মাত্র নিশ্চিন্ত হয়ে কাটিয়েছিলেম বটে, সেই যে দিন হাজতে রেখেছিল। এখন চাঁদাটা দাও ভাই তার জন্যেই এসেছি। আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনা।

রমা। দাঁড়াও একবার তোমার শালীর সঙ্গে দেখাটা করবে না?

উমেশ। না তার সঙ্গে দেখা কত্তে গেলে, সে অন্ততঃ একটা কবিতা না শুনিয়ে ছাড়বে না?

রমা। যা বলেছ, কি ব্যাম ভাই? কি করি কিছু বুঝে উঠতে পারি না। পিসী বলে "উপরি"। বলে ঝাড় ফুঁক কর।

উমেশ। বেশ। কলিমুদ্দির ছেলে বেটাকে ডাক। বেশ ঝাড়ে, ব্যাটা ব্যাড়ায় সিদ্ধ।

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। কি ভাগ্যি আমাদের বাড়ী নতুন লোক যে গো—পথ ভুল নাকি?

উমেশ। ওহে রমানাথ! সাবধান করে দাও, গোড়া থেকেই কড়া কথা সুরু করেছে। (নলিনীর প্রতি) কাল থেকে যার আমি উপোসী রয়েছি, তুই ছুঁড়ি আমায় পথ ভোলবার মত কি দেখলি রে।

নলিনী। উমেশ বাবু, দেখ তুমি একটী বে কর। যা হবার তাত হয়ে গেছে; দিদিত আর ফিরবে না।

উমেশ। ক'রব, দিন কতক যাক। এখনও দাঁতগুলো শক্ত রয়েছে, ওগুলো একটু নরম হয়ে আসুক না।

নলিনী। সে দিন দিদিকে স্বপ্নে দেখেছিলুম। ঘুম ভেঙ্গে মনটার ভেতর কি যে হ'ল বলতে পারি না। দিদির উদ্দেশ্যে একটা "সনেট" লিখেছি; আমার গোড়ার ক'লাইন মনে আছে বলছি।

রমা। (উমেশের প্রতি) এখান হ'তে যাবার সময় তুমি বাইরে আমার কাছদে হয়ে যেও subscriptionএর টাকাটা দেব।

উমেশ। না ভাই, ও ননীর ধাত আমি জানি, ওর শিগ্‌গীর হবে না, আমাকে একলা রেখে যেও না।

নলিনী। দাও দাও ওঁকে ছেড়ে দাও। এমন নীরস প্রাণ—কেবল টাকা নিয়েই আছেন। টাকা! টাকা! টাকা!

উমেশ। তা বটে, কিন্তু দাদা! টাকার মত অমন inspiration আর নেই। তুমি বল—রমানাথ শোন।

রমা। (নলিনীর প্রতি) বল। (মস্তকে হাত রাখিয়া উপবেশন) (উমেশের প্রতি) কলিমুদ্দির ছেলে কোথা থাকে হে?

নলিনী। "যথা, নীড়ভ্রষ্ট বদ্ধ পাখী"—

উমেশ। কোষ্টবদ্ধ পাখী কিরে। এঃ তুই বড় বাড়াবাড়ী কচ্ছিস। কল্পনার রাসটা একটু টেনে রাখিস, একেবারে আলগা দেওয়া কিছু নয়।

রমা। (উমেশের প্রতি) তাকে বাড়ীতে আনা যাবে, না তার কাছে নেযেতে হবে?

নলিনী। আঃ দূর শোন না। যথা,

নীড়ভ্রষ্ট বদ্ধ পাখী লোহার পিঞ্জরে
পড়ে আছি দিদি, হায় করিতেছি ক্রীড়া
সুনিবিড়া কাদম্বিনী বুকে লয়ে—

উমেশ। ওর পর একটা ব্রীড়া যোগ কর; করে last lineএ লেখ "ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুশন্না চ নাড়ী"।

ড় কারের ঐখেনে সপিণ্ডকরণ করে ছেড়েদে।

নলিনী। তার পর তোমার কথা লিখিছি দেখ না। "কার কাছে রেখে গেলে ভোলা দিগম্বর"—এই পর্য্যন্ত লিখেছি! তোমায় বলতে কি, ভাই, দিগম্বরের মিল আমি খুঁজে পাচ্চি না। অম্বর চলে বটে, কিন্তু ও কথাটা ওখানে বসাই কি করে।—তোমার এমন কোন কথা মনে আছে, যার শেষে "ম্ব" আর "র" আছে, অথচ চারটী অক্ষর হওয়া চাই।

উমেশ। বিস্তর, বিস্তর, অভাব কি?

নলিনী। কই বল দেখি, আমিত ঢের ভেবেছি পাই না?

উমেশ। কেন—সেপ্টেম্বর, নবেম্বর, ডিসেম্বর।

নলিনী। যাও তোমার সব কথায় ঠাট্টা। (পিসী নেপথ্যে) বউমা, খোকা হেগেছে—

উমেশ। এঃ বেটী একেবারে Seric-comic করে দিলে!! নলিনি! পৃথিবী কি কঠোর স্থান ভাই, এখানে লোকেরা, হাগে, মোতে, কি বীভৎস ব্যাপার!! কবিতার অমন শত্রু যদি আর আছে?

নলিনী। আমি এখনি আস্‌ছি। তুমি দাঁড়াও, অন্য অন্য কবিতা তোমায় শোনাবার আছে।

[প্রস্থান।

উমেশ। রমানাথ! এই বেলা চল সরে পড়ি।

রমানাথ। সে কলিমুদ্দির বেটা কি নেয় ভাই।

উমেশ। সে হবে এখন। আমি বলে দিলে সে অমনি ঝেড়ে যেতে পারে। তুমি চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

সার দীনেন্দ্রদয়ালের বহির্দ্দালান।

(দীনেন্দ্র দয়াল ও মধু)

দীনেন্দ্র। মধু! এখনও উমেশ বাবু আসে নি?

মধু। আজ্ঞে না, তিনি এখনও ফেরেন নি, সেই দুকুর বেলা বেরিয়েছেন। আমি এই তাঁর ঘর থেকে আসচি।

দীনেন্দ্র। (স্বগতঃ) মাতালে কাণ্ড—তার হয় ত এ খেয়ালই এখন নেই, কোথায় একটু পেয়েছে বসে গেছে।

(উমেশের প্রবেশ)

এই যে একটু মধুর গন্ধ বার হচ্চে। এর মধ্যে একটু হয়েছে বুঝি?

উমেশ। বেশ হয়েছে। দেখছ না কোলের মানুষ একেবারে বাঁদর দেখছি। নিজে রং এ না থাকলে সং দেখে যে সুখ হয় না, ধন। তা আর দেরী কেন, অভ্যাগতগণ সব উপস্থিতত, এইবার কার্য্য আরম্ভ হোক। আমার যা করবার আমি করে রেখেছি। এখন তোমাকে যে রকম যে রকম বলিছি, সেই রকম সেই রকম, কোরো। মধু! তুমি ও ঘরের বাবুদের একে একে ডেকে আন।

মধু। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

দীনেন্দ্র। আচ্ছা ঢলালে। তোমার সে বস্ত কোথায়?

উমেশ। ঠিক আছে। আমি নিজেই তা কাছে রেখেছি, যেই বাবুরা চেয়ারে বসবেন, আমি অমনি টেবিল ছুঁয়ে দাঁড়াব। তা হলেই মন্ত্র লাগবে আর কি?

দীনেন্দ্র। তুমি নিজে বস্ত কাছে রেখেছ, তোমার কিছু হচ্ছে না কেন? তোমার মনের ভাবটাই নয় আগে দেখা যাক।

উমেশ। আমার মনের ভাব বেরুলে, তোমার বড় সুবিধের হবে না। জেনে রাখলে কিছু হয় না।

(মধুর সহিত নবীন বাবুর প্রবেশ)

নবীন। (দীনেন্দ্রর প্রতি) আমাকে কি ডাক্‌লেন?

দীনেন্দ্র। হাঁ আমি ইচ্ছা করেছি, আমরা একে একে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, যে আজ হতে দেশের জন্য, জাতীয় জীবনের জন্য, জীবন পাত করতে কুণ্ঠিত হব না। আপনি কি বলেন?

নবীন। তাতে জিজ্ঞাস্য কি? সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, এ ক্ষুদ্র জীবন যেন ভারতের কার্য্যে ব্যয়িত হয়। দিব ভাই—এ তুচ্ছ প্রাণ অকাতরে, অসঙ্কোচে, দেশের উদ্দেশ্যে বিসর্জ্জন দিব।

(উমেশের টেবিল স্পর্শ করণ)

ঐ ব্যাটা দীনদয়ালকে দিয়ে যদি একটা সুপারিশ বার করে ছেলেটাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট করে দিতে পারি, কেবল সেই চেষ্টায় ঘুচ্ছি। যত ব্যাটা আহাম্মক জুটে এ এক দেশের হ্যাপা তুলেছে মন্দ নয়। কচ্চে করুক, মন্দ কি। এখন মা কালীর কৃপায়, জগু আমার একটা হাকিমী পেলে, সব ব্যাটাকে বুঝে নিই।

উমেশ। (দীনেন্দ্রের প্রতি) কেমন গো আরো শুন্‌বে।

দীনেন্দ্র। ছি ছি একি? একি? নবীন বাবু কি পাগল হলেন? অমন পুণ্যাত্মার মুখে এ সব কি কথা শুনি? না না, আর শুনব না, আর শুন্‌তে চাই না।

উমেশ। কেন শোন না। বলি ঢাল তরওয়াল সানাও, এমন সব সরল দেশ হিতৈষী সেনাপতি থাক্‌তে ভারত উদ্ধারের অসুবিধেটা কি?

(উমেশের টেবিল হইতে অপসরণ)

নবীন। দীনেন্দ্র বাবু! আমার হৃদয়ের রক্ত দিলে যদি ভারতের কণামাত্র উপকার হয়, আসুন, আপনার তরবার আসুন, আমার হৃদয়ে বিদ্ধ করুন, যত ইচ্ছা শোণিত গ্রহণ করুন। হায়! অভাগ্য ভারতবর্ষের অবস্থা পর্য্যালোচনা করে আমি অবসন্ন হয়ে পড়ছি।

উমেশ। (স্বগত) আহা বাছা রে! কি করে যে তুমি এ কটা দিন বেঁচে থাকবে তাই ভেবে আমি ও অবসন্ন হয়ে পড়ছি নবীন বাবু! আপনি আসরে যান।

[নবীন বাবুর প্রস্থান।

(বিষ্ণুকে লইয়া মধুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। কি আনন্দের দিন! কি আনন্দের দিন! আমরা জননী ভারতের দুঃখে রোদন করবার জন্যে ভাই ভাই আজ একত্র হয়েছি।

উমেশ। যা বলেছ। সংক্ষেপেই সেরে নিই। (টেবিল স্পর্শন)

বিষ্ণু। উমেশ ব্যাটা দেখেছ কি? ও ব্যাটাকে-দেখলে আমার গায়ে কাঁটা দে ওঠে। ও যদি আমাকে পিয়ারার ঘরে দেখে থাকে তা হলে আমার সব মাটী, যতই, হা ভারত, হা ভারত, করি।

উমেশ। আ মলো, সেদিন এ ব্যাটা পিয়ারার ঘরে ছেল? তাই তাড়াতাড়ী পালিয়েছিল বটে। ওহোহো ব্যাটাকে একটু যদি দেখ্‌তে পেতুম!! I have missed a treat!!

বিষ্ণু। আজকার এ মিটিং এর কথা নিশ্চয়ই খপরের কাগজে বেরোবে, তা হলে আমার নামও খপরের কাগজে থাকবে। তা হলেই আমি বিখ্যাত হয়ে পড়ব। সকলে বলবে আমিও একজন patriot। কিন্তু উমেশ দেখে থাকেত, সব মাটী, সব মাটী।

উমেশ। Less dangerous than the former। (টেবিল হইতে অপসরণ)

বিষ্ণু। ধন মন প্রাণ সকলই যেন দেশের কার্য্যে উৎসর্গ কত্তে পারি, এ হতে উচ্চতর আকাঙ্খা আমার নাই, আর জগদীশ্বর করুন, যেন তা হ'তে উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা আমার না হয়।

উমেশ। (স্বগত) সস্ত্রীক না হলে কোন যজ্ঞই হয় না। তুমি ভগ্নী পিয়ারাকে বে করে ফেল বাবা।

বিষ্ণু। অ্যাঁ অ্যাঁ কি বলচেন উমেশ বাবু, কি বলচেন?

উমেশ। আজ ক তারিখ জিজ্ঞেস কচ্চি বাবা। বিষ্ণু বাবু আপনি আসরে যান।

[বিষ্ণুর প্রস্থান।

(মিঃ মুখার্জীকে লইয়া মধুর প্রবেশ)

মিঃ-মুখার্জী। To serve my country's cause, through fire and water, I won't scruple to pass.

উমেশ। আরও সংক্ষেপ এবার। (টেবিল ছুঁইয়া দণ্ডায়মান)

মিঃ-মুখার্জী। দিন কাটলেই হল তা যে হুজুক নিয়েই হ'ক। তবে দেশের হুজুকটা বড় respectable। আর বাস্তবিক কথা, দেশটার অবস্থাও বড় খারাপ।

আমার পেটটাও চলে, নামটাও বাজে, আর প্রকৃত পক্ষে সেই সূত্রে Poor India র যদি একটু উপকারও হয়, তা হলে চারদিক বজায় থাকে, সেটা সত্যি সত্যিই বড় সুখের হয়। ভবিষ্যতের history তে আমার নামটাও থাকে।

উমেশ। সার দীনেন্দ্র দয়াল! আমার জীবনে একটা মস্ত ভুল করেছি। আমি জানতুম, এই লোকটা সর্দ্দার ঘুঘু। কিন্তু এখন বুঝছি এই লোকই সর্ব্বাপেক্ষা সজ্জন। নিজের কথার সঙ্গে দেশের কথা, এ একটু ভাবে বটে। আর কোন ব্যাটাই ভাবে না। আমাদের দেশের এ একটা রত্ন।

(টেবিল হইতে অপসরণ)

মিঃ-মুখার্জী। তবে আর এখানে মিছে বিলম্ব কেন? চলুন কার্য্যক্ষেত্রে যাওয়া যাক।

উমেশ। আপনি অগ্রসর হোন। যতদূর সম্ভব, আপনি একজন real patriot সন্দেহ নাই। আপনাকে নমস্কার।

মিঃ-মুখার্জী। নমস্কার।

[প্রস্থান।]

(মিস্ গুপ্তাকে লইয়া মধুর প্রবেশ)

উমেশ। আরে এস গো। তোমার বেলায় আর ঠেকাচ্চি না তুমি একটু আড়ে চেয়ে ইংরিজী চালিয়ে যাও দেখি।

মিস্-গুপ্তা। আপনি এ পবিত্র উৎসবে, মহাকার্য্যে, vulgar পরিহাস কত্তে কুণ্ঠিত নন? আপনার ভগ্নীপতির খাতিরে আপনাকে আমি এবার pardon কল্লেম। ছি ছি, আপনি না ভারত সন্তান?

উমেশ। তবে ঠেকাই। (টেবিল স্পর্শন)

মিস্-গুপ্তা। বিষ্ণুর জন্যে গেলুম, বিষ্ণুর জন্যে গেলুম। বিষ্ণুর কি সেই খানকীটার ওপর সত্যিই মন পড়েছে? উঃ বিষ্ণু, বিষ্ণু, বিষ্ণু, কুক্ষণে বিষ্ণুকে দেখেছিলুম? বিষ্ণুর জন্যেই ত এখানে আমার আসা, নইলে ভারত রইল কি মল, আমার বয়েই গেল।

উমেশ। বড় Jealousy হচ্চে আর শুনতে পারি না। (টেবিল হইতে অপসরণ)

মিস্-গুপ্তা। Throughout the length and breadth of the world, I might sing songs of India's misery

উমেশ। মাইরি, মাইরি !! ও যতই কর পিয়ারা থাকতে তোমার সুবিধে নয়।

মিস্-গুপ্তা। কি বলছেন আপনি ?

উমেশ। বলছি, আপনি ওদের Join করুনগে, আমরা আপনার পশ্চাদ্ধাবন কচ্চি।

[মিস্ গুপ্তার প্রস্থান।]

দীনেন্দ্র। এই যে অনারেবল দীনেশ চন্দ্র এসেছেন। আমি এগিয়েগে তাঁকে receive করি। উমেশ তুমি এখানে থাক।

(দীনেন্দ্র দয়ালের প্রস্থান ও অনারেবল দীনেশচন্দ্রকে লইয়া প্রবেশ)

উমেশ। ও বাবা দলের চাঁই। conference-এর president—

দীনেন্দ্র। এখন আপনার শরীর কেমন ?

দীনেশ। অপেক্ষাকৃত উত্তম, তবে সম্পূর্ণ সুস্থ নয়, আর যে এ জীবনে সম্পূর্ণ সুস্থতা কখন ভোগ কর্ব্ব এরূপ আশা করি না, করাও বৈধ নয়।

দীনেন্দ্র। শরীরের অপরাধ কি ? বিশ্রাম না পেলে শরীর থাকে না, আপনার বিশ্রাম কই।

উমেশ। (স্বগত) এই যে বসলেন তবে আর কেন। কাজের কথা পাড়া যাক।

দীনেশ। আর বিলম্ব কত ?. সকলে সমবেত ?

উমেশ। (টেবিল স্পর্শ করিয়া) আপনার বিবেচনায় আমাদের এ সমস্ত উদ্যোগ কি আশু ফলপ্রদ ? (স্বগত) ঠেকিয়েছি বাবা—তোমার বহর এইবার বুঝব।

দীনেশ। একেবারে সম্প্রতি না হোক, নিকটাভবিষ্যৎ, এইরূপ আমার বিশ্বাস। যে দিকেই দেখুন বিশ্বাস ভিন্ন মানবের গতি নাই। ঐ বিশ্বাসের বলেই আমরা কার্য্য কচ্চি। জীবন দুদিনের, দেশ চিরদিনের, আর দিন দিন দেশের যে অবস্থা দাঁড়াচ্চে, তা ভাবলে শরীর শিউরে উঠে। আমার দুরন্ত ভাবনা ভবিষ্যতের জন্য। এই রকম একত্র মিলনে আর কিছু না হোক মনে যথার্থ বল সঞ্চার হয়, কালে প্রকৃত একপ্রাণ হ'য়ে কার্য্য করবার সম্ভাবনা দাঁড়ায়। জীবন অতি তুচ্ছ তবে মহৎ কার্য্যে ব্যয়িত হ'লে মহতে পরিণত হয়।

দীনেশ। উমেশ ! উমেশ ! ভারতের আকাশ কি চন্দ্রমাবর্জ্জিত ?

উমেশ। (দীনেশচন্দ্রের প্রতি) মহাশয় ! আপনি কায়স্থ আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু তা হ'লেও আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি দেবতা, আমি কৃমিময় জগতের নশ্বরকীট মাত্র। আপনি বুঝলেন না আমার কি উপকার কল্লেন, আমার বিশ্বাসহীন মরুময় মানসে বিশ্বাসের কিরণকণা সঞ্চার করেন।

যখন আপনার মত লোক এ দেশে এখনও জন্মগ্রহণ করে তখন এদেশ একেবারে অভাগ্য নয়, এখনও এদেশের দুর্দশা অপনোদনের আশা আছে। অনুগ্রহ করে সভামণ্ডলে আসুন।

[দীনেশচন্দ্রের প্রস্থান।]

[রামহরি বাবুকে লইয়া মধুর প্রবেশ]

রামহরি। আমার ইচ্ছা আমরা একটা বাড়িতে Legal representation parliament-এর সম্মুখে উপস্থিত করি।

উমেশ। (টেবিল ছুঁইয়া) তার পর।

রামহরি। এ রকম করে আর কদিন চলবে ? সালের পূরণ পাগড়ী দুটো বাঁধা দিয়ে এদের চাঁদা দিলুম। হা ভগবান্ ! সারাটা দিন অশথ তলায় বসে কত দিন আর চালাব ? সংসার যে অচল হয়েছে। হায় হায় হায়, এমন public occasion নেই যেথায় যোগ না দিচ্চি, এত public spirited, patriotic হচ্চি, কিন্তু caseতো একটাও জুটছে না। civil না হয় criminalই বা কই ? লোকে বলে বাঙ্গালীর ঐক্য নাই, এইত এত শালা এখানে জুটেছে, মারামারী না হোক, শালারা একটু রাগারাগীও তো কচ্চে না ? কেবল ভারত, ভারত। মহাভারত ! চাঁদার টাকা দেওয়াই সার। কোন পিত্তেস নেই—কোন পিত্তেস নেই।

[উমেশের অপসরণ।]

আমরা কি না ক'ত্তে পারি ! আমি বলি আমাদের দলের ভেতর দুচার জন আমরা যে mouthpiece রকম আছি পিওনো কোম্পানির জাহাজে বিলেত চলে যাই। সাধারণ কথা ? ভাবলে হৃদয় বিদীর্ণ হতে হয়। দেশ—নিজের দেশ—Shakespere লিখেছেন—Oh motherland—তার পরে কি মনে আসছে না। আমি গরম হয়েছি, কথা কইতে পাচ্চি না। আপনারা এখনি আমার necessary expenses এর সহিত furnish করুন, আমি বিলেত যাই, আজই, সদ্য—

উমেশ। ত্যালা মোর সম্ভব। necessary expense-টার বড্ড দরকার, না ?

রামহরি। কি বলচেন উমেশবাবু ?

উমেশ। আপনি ওঁদের ওখানে যান, দীনেন্দ্রদয়াল বাবু গিয়ে আপনাকে বিলেত পাঠাবার উদ্যুগ করবেন।

রামহরি। Thank you—Thank you।

[রামহরির প্রস্থান ও গাঙ্গুলীকে লইয়া মধুর প্রবেশ]

উমেশ। আ মলো এ ব্যাটাও patriot হয়েছে? না এ patriot গিরিতে ঘেন্না ধরিয়া দিলে বাবা।

গাঙ্গুলী। জননী জানকীশ্চৈচং……শেষের শ্লোকটা মনে হচ্চে না। কি নিয়ে—আসি না কি—এমনি কি হবে। তা দেশ কি সহজ বস্তু? আমি দেশের জন্য প্রাণ দেব, হৃদয় হয়ে যাব, বাপ্, অভিমন্যুর মত যুদ্ধ করব, মতি রায়ের মত রাবণ বধ করব। (উমেশের টেবিল স্পর্শন।)

গাঙ্গুলী। রুপোর গেলোপপাশ আর আতর দান দুটো ভিজে কোন গতিকে সরাতে হবে। পায়ের কাপড়ের ভেতর নিলে কে দেখতে পাবে? (উমেশের অপসরণ)

উমেশ। এই শালা জিতেছে। ওরে একে একটু নজর-বন্দী করে রাখিস।

গাঙ্গুলী। আপনারা চলুন, আমি যা বল্লুম তার একটা হেস্তনেস্ত করা যাক।

[নবীনবাবু, বিধুবাবু, মিঃ গুপ্তা, রামহরিবাবুর পুনঃ প্রবেশ]

সকলে। জয় ভারতের জয়!! জয় ভারতের জয়!! আসুন আর বিলম্ব কেন? বিলম্বে আমাদের উদ্যম-ভঙ্গ হতে পারে। জয় ভারতের জয়!!

উমেশ। জয় বাঙ্গালীর জয়!! জয় patriot-এর জয়!! Sir দীনেন্দ্র দয়াল চলুন বীরাগ্রগণ্যদের উদ্দাম-ভঙ্গ বিধেয় নয়। চলুন, জননী ভারতের সপিণ্ড-করণ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করা যাক্‌গে। বীরগণ! আমি লম্বা বক্তৃতার দ্বারাই আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করতে ইচ্ছে করি না। তবে একটা কথা এই—

নবীন। এখন আর কোন কথা নয় কেবল কথার মধ্যে—জয় ভারতের জয়!!

সকলে। জয় ভারতের জয়!! আসুন সভামণ্ডপে আসুন। আর বিলম্ব নয়। উদ্যমে আমরা পরিপূর্ণ হয়েছি। এই কার্য্যারম্ভের কিন্তু উপযুক্ত সময়।

সকলে। জয় ভারতের জয়!!

উমেশ। (সুর করিয়া) তোদের গাল দেব কি বলে, গাল হেরে যায় তোদের গালে!!

[সকলের প্রস্থান।

একটি অনালোচিত নাটক ঃ কষ্টি-পাথর

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

'কষ্টি-পাথর' নাটকটি ১৮৯৭ সনে প্রকাশিত হয়। নাটকের লেখক রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রকাশক শ্রী ধর্মদাস সুর। এর গানগুলির সুর দিয়েছিলেন যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৯৭ সনে এই নাটকটি এমারেল্ড থিয়েটারে দেখানো হয়। রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন সম্বন্ধে বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রামাণ্য বইগুলিতে যেমন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', সুশীলকুমার মুখার্জির কিছুদিন আগে প্রকাশিত 'দি স্টোরি অফ দি ক্যালকাটা থিয়েটার্স'-এ কোন খবরাখবর পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে অন্যান্য নাটকগুলো লিখেছিলেন তার ফিরিস্তি আশুতোষ ভট্টাচার্যের বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের দুই খণ্ডে পাওয়া যায়। ১৮৯৩ সনে 'কমলা' তাঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক। এর পর ১৯০২-এ যে তিনটি তাঁর নাটক ছাপা হয় সেগুলো হল 'অভিষেক', 'অনাথিনী' আর 'প্রেমপাশ'। (২) ১৯০৪-এ বেরোয় তাঁর 'পেয়ার' আর ১৯০৬ সনে 'অদৃষ্ট' ও 'চাঁদের হাট'। কিন্তু আশ্চর্য আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুশীল মুখার্জি আর অজিত ঘোষ কেউই 'কষ্টি-পাথর'-এর নাম করেননি। এছাড়া দেখছি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'নাট্য-মন্দির' নামে মাসিক পত্রিকায় ১৩২০-র শ্রাবণ মাসে (চতুর্থ বই প্রথম সংখ্যা) তিনি কবি-সংবাদ বলে ১৭ পাতার একটি সরস কাব্য লেখেন। এই সময়ে বাজীরাও (১৯১১) আর রানী লীলাবতী (১৯১২) নাটকের লেখক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিত 'নাট্য-মন্দিরে' লিখতেন। জানি না তাঁর সঙ্গে রামলালের সম্পর্ক ছিল কি না।

বলার দরকার নেই যে পুরোনো কাগজ-পত্রিকা ইত্যাদি ঘাঁটলে রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন বৃত্তান্ত ও রচনাবলীর কথা জানা যাবে। এও অসম্ভব নয় যে বিভাব পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কেউ কেউ থাকতে পারেন যাঁরা এই নাট্যকার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। তাঁদের মধ্যে কেউ যদি দয়া করে এ সম্বন্ধে এই পত্রিকায় কিছু লেখেন তাহলে আমার মতন অনেকেই উপকৃত হবেন।

সিটি থিয়েটার-এর তরফ থেকে 'কষ্টি-পাথর'-এর প্রকাশক ধর্মদাস সুর বাংলা রঙ্গমঞ্চের আদি যুগের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। ধর্মদাসের জন্ম ১৮৫২ সনে এবং মৃত্যু ১৯১০ সনে। তিনি তাঁর সময়ের সবচেয়ে সেরা মঞ্চ-নির্মাতা, মঞ্চ-সজ্জাকার 'সিনারি পেণ্টার' ছিলেন। ১৮৭১ সনে তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাগবাজার ন্যাশানাল থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ধর্মদাসের মারা যাবার পর গিরিশচন্দ্র "নাট্যশিল্পী ধর্মদাস" নাম দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান এবং তার সঙ্গে ধর্মদাসের একটি কয়েক পাতার 'আত্মজীবনী' ছাপান। গিরিশচন্দ্র এক জায়গায় লিখেছেন যে "সমস্ত বঙ্গ রঙ্গালয়ই তাঁহার নিকট আংশিক বা সম্পূর্ণ ঋণী।" ১৮৭২ সনে নীলদর্পণের যে অভিনয় দিয়ে বাংলা পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের পত্তন হয় ধর্মদাস তার সাজসজ্জা, সিন পেনটিং এবং সমস্ত কিছুর পরিকল্পনা ও তৈরির কাজ করেছিলেন। ধর্মদাসকে সকলেই এক বাক্যে কলকাতার থিয়েটারের একজন 'প্রতিষ্ঠাতা' বলে স্বীকার করেছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর ছোট্ট লেখাটিতে আরও বলেছেন যে 'বেলুড় মঠের মহোৎসবে তিনি কয়েক বৎসর উপর্যুপরি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিংহাসন সজ্জিত করিয়াছিলেন।'

'কষ্টি-পাথর' নাটকটিকে রামলাল পঞ্চরং বলে আখ্যাপত্রে বর্ণনা করেছিলেন। অর্থাৎ ইংরিজিতে যাকে বলে ম্যাটায়ার। নাটকটি কেমন তা বিচার করবেন পাঠক-পাঠিকারা। তবুও এর সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা দরকার মনে করছি। এই নাটকের আসল বক্তব্য হল স্বদেশপ্রেম নিয়ে যাঁরা সব কিছু ত্যাগ বা জীবনপাত করবেন বলে সভা-সমিতিতে এবং সর্বত্র চীৎকার করতেন তাঁদের মধ্যে নাটকের চরিত্রের মাত্র একজন ছাড়া সবাই স্বার্থান্বেষী ভণ্ড। প্রত্যেকের আসল মতলব ছিল দেশপ্রেমের নাম করে কোলে ঝোলটানা। কথাটা সে যুগের চেয়ে অবশ্য আজকের দিনে ঢের বেশি সত্যি।

কিন্তু নীতি সেখানেই উদ্দেশ্য হোক বা না হোক 'কষ্টি-পাথর'-এর আসল জোর হল এর মজাদার রচনাভঙ্গী। এর প্রধান চরিত্র উমেশ ছিলেন জমিদার স্যার দীনদয়ালের সম্বন্ধী। উমেশ নিমে দত্তর মতন গলগল করে সেকস্‌পিয়ার, গোপ আওড়াতে না পারলেও একদম তার ধাঁচে গড়া। একটু মস্করা করে ইংরিজিতে বলা যায় যে উমেশ Poor man's Nimey Datta. নিমে দত্তর মতন সর্বদাই সুরাপ্রেমে জর্জরিত করতে ওস্তাদ। নিমের দাড়ি, শিক্ষিত ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন আর মস্ত, বিদ্রূপ বাণে লোককে আর সবচেয়ে বড় কথা আদতে সাচ্চা লোক। উমেশই নাটকটাকে গোড়া থেকে শেষ অবধি চালিয়ে নিয়ে যায়। তখনকার দিনে

আরও অনেক নাটক-নভেলের মতন এই নাটকেও শিক্ষিতা মহিলা ও ব্রাহ্মদের প্রতি কটাক্ষ আছে। এর গানগুলিও খুব মজার। কয়েক বছর আগে এর নাপতিনির গানটি তরুণ রায় পুরনো অনেক বাংলা প্রহসনের থেকে মজার মজার সিন নিয়ে পরিবেশন করেন। আমার মনে আছে মধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় এই গানটি শুনে দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়েছিলেন। একথা বলার দরকার করে না অভিনয়ের দিক্ থেকে দেখলে 'কষ্টি-পাথর'-এর কিছু কিছু অংশ যেমন দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য বেশ দুর্বল। ভগীপতি স্যার দীনেন্দ্র আর উমেশের সঙ্গে লম্বা তর্কাতর্কি আর লেকচার দর্শকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে বাধ্য। আর একটা কথা বলা দরকার। রসিকতার fancy বা চেকনাইয়ের দিক থেকে 'কষ্টি-পাথর' অবশ্য 'সধবার একাদশী'-র ধার কাছ দিয়ে যায় না। তবে একথাও ঠিক যে এরও রসের সূক্ষ্মতা, খাঁটি বাঙালি মেজাজ আর মাঝে মাঝে কাঁচা বলিষ্ঠতা ফেলনার নয়। যা পড়ে আধুনিক এখনকার পাঠক-পাঠিকারাও মজা পাবেন। রামলাল সত্যিই কৌতুক রসের ভাণ্ডারি ছিলেন যে জীবটি এখন আজকালকার বাংলা-সাহিত্য থেকে প্রায় উঠে গেছে বল্লেই চলে।

গ্রন্থাগার—গণশিক্ষার একটি মাধ্যম

গ্রন্থাগারের মত গণশিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম দীর্ঘকাল অনাদৃত পড়ে ছিল। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন শিক্ষানীতি এবং নবপর্যায়ে গৃহীত কয়েকটি ব্যবস্থার আওতায় গ্রন্থাগারের কাজ বিপুল উদ্যমে এগিয়ে চলেছে।

গত সাত বছরে সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭৭৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪১৬। এছাড়া ১৯৭১ সালের গ্রন্থাগার আইন এবং তার কয়েকটি সংশোধনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলিকে আরো সুচারু-ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। যথাযথ কার্যনির্বাহ এবং উন্নয়নের জন্য স্থাপিত হয়েছে একটি গ্রন্থাগার অধিকার ও একটি গ্রন্থাগার সংসদ।

সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে সুচিন্তিত জনমত গড়ে তোলার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধাকে এমনকি সুদূর পল্লীগ্রামেও পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ৮৩৭টি গ্রন্থাগারে খোলা হয়েছে শিশু-বিভাগ, সারা ভারতবর্ষে এর নজীর আর নেই।

৯-১৪ বছর বয়েসের যেসব, ছেলেমেয়ে অর্থনৈতিক কারণে বা জীবিকার্জনের জন্য বিদ্যালয় ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, তাদের জন্য খোলা হয়েছে ১৬,৬৬০টি প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্র। গত ৪ বছরে এইসব কেন্দ্রে ১১.৭৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার্জন করেছে। সরকারের ৩৪ দফা কর্মসূচীর অন্তর্গত বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পের ২২ হাজার কেন্দ্রেও শিক্ষালাভ করেছেন ৬ লক্ষ মানুষ। এঁদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগার-গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বই আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুফল পৌঁছে দেবার কাজে এগিয়ে আসতে হবে প্রতিটি সচেতন মানুষকে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২৪৩২/আই. সি. এ/৮৫

প্রবন্ধ

ডিরোজিওগুরু ডেভিড ড্রামণ্ড

সুবীর রায়চৌধুরী

শিষ্য ডিরোজিও-র মতোই ডেভিড ড্রামণ্ড-এর (১৭৮৭-১৮৪৩ খ্রী) জীবন পতন-অভ্যুদয়ে বন্ধুর। অনেক ব্যাপারেই তাঁদের মিল ছিলো। দুজনেই ছিলেন শিক্ষক, কবি এবং সাংবাদিক। তবে ড্রামণ্ড ডিরোজিও-র মতো স্বল্পায়ু না হ'লেও ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য জীবনের শেষ দশ-বারো বছর পঙ্গু ও নিঃসঙ্গ হ'য়ে পড়েছিলেন। অত্যন্ত সচ্ছলতার মধ্যে জীবনযাপন ক'রে পরে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে মারা যান। তাঁর কবিতার বই শুধু অগ্রন্থিত নয়, পাণ্ডুলিপিও লুপ্ত। একটি বইই তিনি শুধু প্রকাশ ক'রে যেতে পেরেছিলেন, সেটি হ'লো 'অবজেকশন্‌স্ টু ফ্রেনোলজি'। আর তিনি সাংবাদিক হয়েছিলেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে, যখন তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে।

ছাব্বিশ বছর বয়েসে ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে স্কটল্যাণ্ড থেকে ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে চ'লে আসেন ডেভিড ড্রামণ্ড। তেরো বছর আগে স্কটল্যাণ্ড থেকে এমনি আরেকজন এসেছিলেন এদেশে। তিনি হলেন ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২ খ্রী)। দুজনের কেউই আর স্বদেশে ফিরে যাননি। হেয়ার এদেশের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে গিয়েছিলেন। ড্রামণ্ডের ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ধরনের ছিলো। হেয়ারের মতো হিন্দু সমাজ অথবা ছাত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ তাঁর ছিলো না। সাধারণ দেশবাসীর সঙ্গে দূরত্ব বা ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও ড্রামণ্ড এদেশকে ভালোবেসেছিলেন। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে তাঁর ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আরেকজন স্কটল্যাণ্ডবাসীর কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। তিনি হলেন আলেকজাণ্ডার ডাফ (১৮০৬-৭৮ খ্রী)। তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন চব্বিশ বছর বয়েসে। এদেশে হেয়ারের আগমন ব্যবসায় উপলক্ষে। কিন্তু পরে তিনি ব্যবসায় ছেড়ে জনহিতকর কর্মে নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেন। ডাফ ভারতবর্ষে এসেছিলেন খ্রীষ্টধর্মপ্রচার এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সংকল্প নিয়ে। ডাফের মতো বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র ড্রামণ্ডের ছিলো না। বস্তুত তাঁর বিষয়ে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে তিনি যে শিক্ষাব্রত নিয়েই ভারতবর্ষে এসেছিলেন, এমন কথা নিশ্চিত ভাবে বলা মুশকিল। কিন্তু এই বৃত্তিতে তাঁর যোগ্যতা এবং প্রভাব আজ তর্কাতীত। হেয়ারের মতো এদেশীয় মহলে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা ছিলো না, অন্যদিকে ডাফের মতো বিতর্কিত ব্যক্তিও তিনি নন। কেননা শিক্ষিত হিন্দু-সমাজের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ বা সংঘাত কখনো হয়নি। তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে ড্রামণ্ড অবিস্মরণীয়।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ এপ্রিল ডেভিড ড্রামণ্ডের মৃত্যু হ'লে 'ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিন' (১ খণ্ড, ৫ সংখ্যা, মে ১৮৪৩ খ্রী)-এ প্রকাশিত শোকবার্তায় বলা হয় যে তিনি ছিলেন বহু গুণের আধার প্রতিভাবান ব্যক্তি। এই দেশের বিশিষ্ট মেটাফিজিশিয়ানদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। বয়েসকালে আলাপচারিতায় তাঁর কোনো জুড়ি ছিলো না। পুরোটা না হ'লেও জীবনের অনেকটাই তিনি কাটিয়েছেন সাহিত্যচর্চায়। এদেশের সঙ্গে তাঁর যোগ তিরিশ বছরের। ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রবীণ ব্যক্তি।

পূর্বোক্ত পত্রিকার পরের সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে ড্রামণ্ডের জীবনী প্রকাশিত হ'তে শুরু করে। রচনাটি অস্বাক্ষরিত, কিন্তু অনেকের অনুমান এর লেখক সি. জে. মণ্টেগু। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে একই পত্রিকার একই বছরের দশম সংখ্যায় ডিরোজিওর যে জীবনকাহিনী ছাপা হয় বিশেষজ্ঞদের ধারণা তারও লেখক মণ্টেগু। যাই হোক, ডেভিড ড্রামণ্ড সম্পর্কিত রচনাটি ডিরোজিওর অধিকাংশ চরিতকারই দেখেননি। ফলে ড্রামণ্ড বিষয়ে অনেক ভুল ধারণা চ'লে আসছে, বিশেষত তাঁর দেশত্যাগের কারণ এবং ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে।

ডেভিড ড্রামণ্ড ঠিক কোথায় জন্মেছিলেন জানা যায় না। তবে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জানুয়ারি তিনি সিলভার লেডেন তীরবর্তী ফাইফশায়ার চিরকালের মতো ত্যাগ ক'রে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করেন। লণ্ডনে পৌঁছোতে তাঁর আটদিন লেগেছিল। তাঁর আরো চার ভাই এবং তিন বোন ছিলো। তাঁর বাবা ছিলেন 'প্রতিবাদী

পাদ্রী' অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক চার্চের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ছিলো। টমাস এডওয়ার্ডস থেকে যোগেশচন্দ্র বাগল পর্যন্ত ডিরোজিওর বহু জীবনীকার লিখেছেন যে ড্রামণ্ডের সঙ্গে বাড়ির লোকেদের মতান্তরের কারণ তাঁর পাদ্রি হ'তে অস্বীকার করা। কিন্তু পিতা স্বয়ং যেখানে প্রতিবাদী, সেখানে ছেলেকে যাজক হবার জন্য জোর করবেন ব'লে মনে হয় না; ড্রামণ্ডের নথিপত্র থেকে তাঁর দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো হদিশ পাওয়া দুরূহ। তবে ভাইদের সঙ্গে গুরুতর মনোমালিন্য হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। কলকাতা থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি তাঁর এক ভাইকে লিখেছিলেন :

> ভেবেছিলাম ইউরোপ ছেড়ে যাবার আগে তোমাদের লিখবো, অবশ্য সেটাও শুধু বিদায় জানাবার জন্য। কিন্তু তখন আমার যা মানসিক অবস্থা, আমি ভাবলাম মেজাজ ঠিক রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমাদের সম্পর্কে এমন চিড় ধরবে যা সহজে জোড়া লাগাবার নয়। এখন কিছুটা সময় কেটে যাওয়ায় সেই যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির উপশম হয়েছে। আমি পুরোপুরি তুষ্ট এই ভেবে যে আমি বিচক্ষণের মতোই কাজ করেছিলাম।
>
> এটা ঠিক যে যাদের আবার দেখা হওয়াটা সুদূর পরাহত, সেই আমাদের ছাড়াছাড়ি ভ্রাতৃসুলভ হয়নি। কিন্তু ঐ প্রশ্ন নিয়ে আমি আর উত্তেজিত হবো না। আমাদের মধ্যে এখনও তীব্র মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু সেগুলি চাপা থাক—রক্তের সম্পর্ক বাঁচানো গেছে। শত হার্দ্য বিরোধ সত্ত্বেও তা একেবারে ঘুচে যায় না।[১]

এখানে লক্ষণীয় যে উদ্ধৃত পত্রাংশে পিতৃপ্রসঙ্গ নেই। সুতরাং ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়ায় বাবার দায়িত্ব কতটা আমরা জানি না। যাই হোক, জনৈক স্মল-এর চেষ্টায় তিনি ভারতগামী জাহাজ 'নর্দাম্বারল্যাণ্ড'-এ জায়গা পান। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২ জুন জাহাজটি পোর্টসমাথ বন্দর থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। পাঁচ মাস লেগেছিল কলকাতায় পৌঁছোতে।

জাহাজ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সুখপ্রদ হয়নি তাঁর। সহযাত্রীদের সঙ্গে খুব একটা বনিবনাও হ'তো না তাঁর। তিনি তাঁদের খল এবং বর্বর-স্বভাবের ব'লে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া শরীরটাও সুবিধার ছিলো না। ড্রামণ্ড শিক্ষিত ছিলেন ব'লে তাঁর ওপর লগবুক রাখার দায়িত্ব ছিলো। এই সুযোগে তিনি নৌবিদ্যাও কিছুটা শিখে ফেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সেযুগে কলকাতার অনেক স্কুলে নৌবিদ্যা পড়ানো হ'তো। 'দ্য ক্যালকাটা রিভিউ'-তে[২] প্রকাশিত কলকাতার

Numbering

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিষয়ক একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধে দেখতে পাই যে কিড-এর উদ্যোগে খিদিরপুর ডকের প্রতিষ্ঠা হ'লে নৌবিদ্যার চাহিদা খুব বেড়ে যায়। এখানে অনেক জাহাজও তৈরি হ'তো। সুতরাং নৌবিদ্যায় সামান্য জ্ঞান থাকলেই চাকরি জুটে যেতো।

কলকাতায় পৌঁছোবার পর তিনি দিন দশেক কাটিয়ে বহরমপুরে জনৈক ক্রিস্টির বাড়ি গমন করেন। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন,

> ব্রিটিশ অধিকারে পদার্পণ করিবার উপায় নাই, কেন না 'লাইসেন্স' বা অনুজ্ঞাপত্র তাঁহার ছিল না। তিনি সরাসরি ডাচ-শাসনাধীন শ্রীরামপুরে আসিয়া উপনীত হন। এখান হইতে ব্রিটিশ অধিকারে যাইতে বাধা নাই।[১]

এই তথ্যের ভিত্তি কী জানি না। তবে ড্রামণ্ড যাজকপুত্র ছিলেন এই ধারণাও অনুমানের ভিত্তি হ'তে পারে। কেননা সে যুগে বৃটিশ শাসিত এলাকায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের খুব কড়াকড়ি ছিলো।

ড্রামণ্ড বহরমপুরে থাকাকালীন 'ধর্মতলা একাডেমি'তে একটি শিক্ষকের পদের জন্য কাগজে বিজ্ঞপ্তি বেরোয়। তিনি দরখাস্ত করেন এবং ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি ইন্টারভিউ দেবার পর তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হন। তাঁর মাইনে ছিলো বার্ষিক ১৫০ পাউণ্ড (টমাস এডওয়ার্ডস লিখেছেন মাসিক ১২৫ টাকা)।

ড্রামণ্ড 'ধর্মতলা একাডেমি'তে যোগ দেবার পর এই স্কুলের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। কেননা তিনি ছিলেন জাতশিক্ষক। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার আগে সেযুগের বিদ্যালয় এবং পঠনপাঠনরীতি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সরকারি এবং বেসরকারি দপ্তরে ইংরেজিজানা কর্মীর চাহিদা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেকালে ব্যাঙের ছাতার মতো ইশকুল গজাতে শুরু করে। যে অন্য কোনো কাজ পেতো না, বিশেষভাবে তার মাতৃভাষা যদি ইংরেজি হ'তো, তাহ'লে সে একটা স্কুল তৈরি করতো। সেনাবিভাগে বাতিল সৈনিক, দেউলিয়া বণিক, অর্ধশিক্ষিত বেকার প্রভৃতি সবারই শেষ সম্বল ছিলো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ফলে অধিকাংশ স্কুলেই বিদ্যার মান ছিলো অতি নীচু। কয়েকটি শব্দের বানান ও উচ্চারণ, ব্যাকরণের দু-একটি নিয়ম, ভূগোল ও গণিত বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান—এটুকুই যথেষ্ট বিবেচিত হ'তো। নীলকর সাহেবদের দপ্তরে অথবা সওদাগরি হৌসে কাজের জন্য এতেই চ'লে যেতো।

কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে এরকম অব্যবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না। কলকাতা শহরে সেই সময়ে টোল-মাদ্রাসা-চতুষ্পাঠীর ব্যবহারিক উপযোগিতা ক'মে যাচ্ছে। অন্যদিকে বিকল্প পাশ্চাত্য শিক্ষা অযোগ্য শিক্ষকের হাতে প'ড়ে পরিণামে ক্ষতিকর হ'লো। শিক্ষার প্রয়োজন তো শুধু অর্থোপার্জনের জন্য নয়, সুশাসনের জন্য চাই সুশিক্ষিত কর্মী। এদেশে ইংরেজ শাসন যতোই কায়েম হ'তে লাগলো, ততোই শাসকগোষ্ঠী এ-বিষয়ে সচেতন হ'তে লাগলেন। গোড়ায় তাঁরা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কেননা তাঁদের আশঙ্কা ছিলো যে ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ পেলে ক্রমে ক্রমে ইংরেজদের সঙ্গে সমানাধিকার দাবি করবে। ঔপনিবেশিক ইংরেজ বিদেশে যতোই অত্যাচারী হক না কেন, স্বদেশে তাঁরা স্বাধীনতার পূজারী। কিন্তু পরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা গেলো কেরানিকুলও যদি ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানি করতে হয়, তাহ'লে শাসনব্যবস্থা অচল হ'য়ে পড়বে। সুতরাং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বদল হ'লো। 'ক্যালকাটা রিভিউ'-তে প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধে সেযুগের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে চারটি শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। যেমন,

১ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থাপিত বিদ্যালয়
২ অভিজাত গোষ্ঠীর পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়
৩ মিশনারিদের উদ্যোগে পরিচালিত বিদ্যালয়
৪ সরকারি বিদ্যালয়

পলাশির যুদ্ধেরও দশ বছর আগে প্রথম ইংরেজি বিদ্যালয় 'ফ্রী স্কুল' স্থাপিত হয় দরিদ্র-অনাথ খ্রীষ্টান ছাত্রদের জন্য। অনেকের মতে ইংরেজদের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত দাতব্য সংগঠনগুলির মধ্যে এটিই প্রথম। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য একটি তহবিল তৈরি হয়। পরে আরো অনেকে অর্থদান ক'রে বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা সমৃদ্ধ করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌল্লার সেনাবাহিনী ইংলিশ চার্চ ভেঙে ফেললে আবার তা গ'ড়ে তোলার জন্য যে-অর্থ সংগৃহীত হয়, তার উদ্বৃত্ত অংশ বিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে জমা পড়ে। তাছাড়া জনৈক কনস্টানটিন ছয়-সাত হাজার টাকা দান করেন। বোম্বাই প্রদেশের গভর্নর বাউরচিয় অনেক টাকা দিয়েছিলেন। সরকারি সাহায্যও নিয়মিত পেতো স্কুলটি।

বাউরচিয় বোম্বাইয়ের ছোটোলাট হবার আগে কলকাতার মাস্টার অ্যাটেনডাণ্ট

ছিলেন। তাছাড়া ব্যবসা ক'রেও তিনি প্রচুর টাকার মালিক হন। সে-সময়ে কলকাতার পৌরপ্রতিষ্ঠানের মেয়র এবং অল্ডারম্যানদের দপ্তরে ব'সে কাজকর্ম করা এবং সভাসমিতির জন্য আলাদা কোনো ঘর ছিলো না। এই অসুবিধা দূর করবার উদ্দেশে বাউরচিয় ওল্ড কোর্ট হাউসে একটি অট্টালিকা নির্মাণ ক'রে সরকারকে দান করেন। তাঁর শর্ত ছিলো যে সরকার এর বিনিময়ে বার্ষিক চার হাজার আর্কট টাকা কোনো বিদ্যালয়ে (দাতব্য প্রতিষ্ঠান হওয়া চাই) দান করবেন। এই সব সাহায্য সত্ত্বেও ক্রমে দেখা গেলো যে পুরনো দাতব্য বিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীদের পুরো প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। তখন 'চ্যারিটি স্কুল' এবং 'ফ্রী স্কুল সোসাইটি' (ডিসেম্বর ১৭৮৯)-র তহবিল একত্র ক'রে বিদ্যালয়টি আরো সমৃদ্ধির পথে এগোয়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ডে-স্কলার বা অনাবাসিক ছাত্র নেওয়াও শুরু হয়। বৈতনিক ছাত্রদের জন্য একটি বিভাগ খোলা হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। ইংরেজি শিক্ষার এই আদি প্রতিষ্ঠানটিতে ছেলে-মেয়ে উভয়েই পড়তে পারতো।

'ফ্রী স্কুলের' জনপ্রিয়তায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে জনৈক আর্চার ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ছেলেদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেযুগে আর্চার-এর স্কুলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো ফ্যারেল-এর সেমিনারি এবং 'ধর্মতলা একাডেমি'। তাছাড়া হালিফ্যাক্স, লিণ্ডস্টেড্‌ট ও ড্রেপার-এর স্কুলেরও অল্প-বিস্তর খ্যাতি ছিলো।

ডিরোজিওর জীবনীকারদের অনেকেই শেরবোর্নের স্কুলের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'ক্যালকাটা রিভিউ'-তে প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এই পাঠশালা বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। শেরবোর্নের মা ছিলেন ব্রাহ্মণকন্যা। তিনি প্রাচীন প্রথামতো গুরুদক্ষিণা নিতেন। চিৎপুরে অবস্থিত তাঁর বিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ ছাত্রদের অন্যতম হলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর এবং ডিরোজিওশিষ্য রামগোপাল ঘোষ। কৈলাসচন্দ্র বসু তাঁর 'রামগোপাল ঘোষ' বিষয়ক পুস্তিকায় শেরবোর্নের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে পাই তিনি 'কালো মাঝারি উচ্চতাবিশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট গড়নের ছিলেন'। তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ বিষয়ে কৈলাসচন্দ্র বসু লিখেছেন, 'চীনেবাজারের দোকানদারদের মতো'।[৪]

এবারে এদেশীয়দের প্রচেষ্টায় স্থাপিত ইংরেজি বিদ্যালয়গুলির কথা বলা দরকার। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ইউনিয়ন স্কুল' বোধহয় এ ব্যাপারে পথিকৃৎ। রাজা রামমোহন নাকি হিন্দু কলেজের (১৮১৭) পূর্বে একটি অবৈতনিক ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেছিলেন।[৫] তিনি তাঁর বন্ধু উইলিয়ম অ্যাডামস-এর সাহায্যে 'অ্যাঙ্গলো-হিন্দু স্কুল' নামে আরেকটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে

দেখতে পাই এই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা একশো। এর পরেই নাম করতে হয় গৌরমোহন আঢ্য প্রবর্তিত 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'-র। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের একজন হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই স্কুলে ৫৮৫ জন পড়তো। একই সময়ে 'শীলস ফ্রী কলেজে' শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলো ৩০০।

বোঝাই যাচ্ছে যে ইংরেজি শিক্ষার চাহিদা ক্রমে বাড়ছিল। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত স্কুলগুলির মতোই ভারতীয় পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশেরই মান খুব একটা উন্নত ছিলো না। গৌরমোহন আঢ্য তো উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের সামনে স্বীকারই করতেন যে তাদের পড়াবার মতো যোগ্যতা তাঁর নেই। তবে স্কুলের হিতসাধনে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন।

কিন্তু বিদ্যালয় বলতে যেরকম জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার মিলনস্থল বোঝায়, সেরকম চেহারা বেশির ভাগ স্কুলেরই ছিলো না। সেই অর্থে এর পরিবেশ ছিলো সংকীর্ণ এবং সাম্প্রদায়িক। একই ক্লাসঘরে পাশাপাশি ইউরোপীয়, ইউরেশীয় এবং অন্যান্য ভারতীয় ছাত্র পড়ছে, সে যুগে এ দৃশ্য সত্যিই বিরল ছিলো। সেদিক দিয়ে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম 'ধর্মতলা একাডেমি'। এই বিদ্যায়তন সব সম্প্রদায়, সব শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য অবারিত দ্বার ছিলো। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বরের সংখ্যায় এই মন্তব্য করা হয় :

> It was very pleasing to see so many Hindoo youths, as belong to this School (Durrumtollah Academy), besides their Christian fellow students entering the same lists with them, and with them contending for fame. Slight beginnings of this nature may, imperceptibly pave the way to a general amalgamation among the two communities, and be the means of bringing us nearer to our Native fellow subjects than the course of circumsstances has hitherto permitted. Friendships and attachments formed in early life among some of those whom we had the gratification of seeing in the same classes on Saturday last, community of thought and sentiment, and other matters which from their apparently trivial nature, scarcely enter into the calculation, may, ere long, make us well acquainted

with the hearth stones and household gods of those among we live as utter strangers, and over whom we rule without having the means of being well acquainted with their domestic and social wishes and opinion.

(Quoted in *The Days of John Company : Selections from Calcutta Gazette 1824-1832*. Compiled and edited by Shri Anil Chandra Das Gupta, Calcutta. n. d. p. 597.)

'ধর্মতলা একাডেমি'র প্রাক্তন ছাত্র হরিদাস বসু স্মৃতিচারণ করেছেন এইভাবে :

২৯ ডিসেম্বর ১৮২১। ১৬ পৌষ ১২২৮

ইস্তেহাম অর্থাৎ পরীক্ষা।—মোকাম কলিকাতাতে যেখানে ২ ইঙ্গরেজী পাঠশালা আছে তাহার পূর্ব্বাপর এই রীতি আছে যে বড় দিনের সময়ে সেখানকার তাবৎবালকের পরীক্ষা হয় তাহাতে যে ২ বালকেরা পূর্ব্ব বৎসর হইতে পর বৎসরে অধিক বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে তাহারা স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি পারিতোষিক পায়। তাহাতে ২১ ডিসেম্বর শুক্রবার ধর্ম্মতলার শ্রীযুত দ্রমন্দ সাহেবের স্কুলে পরীক্ষা সময়ে কলিকাতার শ্রীযুতবাবু গোপীকৃষ্ণ দেবের জামাতা শ্রীযুত হরিদাস বসু উঠিয়া সকলের সাক্ষাৎকারে কহিলেন যে আমি এই স্কুলে পাঁচ বৎসর থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলাম ইহাতে স্কুলের অধ্যক্ষ সাহেবদের আমার প্রতি যেমত অনুগ্রহ তাহা আমি কহিয়া কি জানাইব এবং এই সংসারে যত দান আছে বিদ্যাদানের তুল্য কোন দান নহে এই বিদ্যা আমাকে দান করিয়াছেন অতএব আপনাদের অনুগ্রহেতে আমি কৃতবিদ্য হইয়া কর্ম্মান্তরে প্রস্থান করি ইহা কহিয়া অতি মনোদুঃখে বিদায় হইলেন। পরে অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহার বাক্যেতে তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক এক কেতাব দিলেন ও তাহার উপায়ের সৎ পরামর্শ তাহারা দিলেন।

('সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড ১৮১৮-১৮৩০, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ৩৫ থেকে উদ্ধৃত।)

বস্তুত শুধুমাত্র এই কারণেই 'ধর্মতলা একাডেমি'র বিশেষ গুরুত্ব ও গৌরব আছে। যদিও আরো বহু বিষয়ে স্কুলটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। আসলে ডেভিড ড্রামণ্ড ছিলেন মহৎ অর্থে পেশাদার শিক্ষক। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডিত্য তাঁর সহৃদয়তাকে আচ্ছন্ন করেনি। সেজন্য কঠিন শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিলো সহজ ও সুন্দর।

তিনি স্কুলে যেসব নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, তার মধ্যে আছে : ১. বার্ষিক পরীক্ষাগ্রহণ ২. ভূগোল পড়াবার জন্য গ্লোবের ব্যবহার ৩. ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণের রীতিমতো পঠনপাঠন ৪. ইংরেজি সাহিত্য পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা ৫. রোমান ক্লাসিক্স পাঠের সূচনা। তাঁর বিদ্যালয়ের বিপুল জনপ্রিয়তার কাছে নিষ্প্রভ হ'তে হ'তে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় ফেরেল-এর সেমিনারি।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি 'গভর্নমেণ্ট গেজেটে' ধর্মতলা একাডেমিতে গৃহীত পরীক্ষার বিষয়সূচি এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা প্রকাশিত হয়। তা থেকে পাঠক্রম সম্পর্কে অনেক তথ্য আমরা জানতে পারি। যেমন ওখানে ভাষাশিক্ষার মধ্যে ছিলো ইংরেজি, ফরাশি, ল্যাটিন, গ্রীক, ফারশি এবং বাঙলা। তাছাড়া গণিত এবং বুককীপিং, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি এবং বীজগণিতও পড়ানো হ'তো। সবচেয়ে কম ছাত্র ছিলো বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতির ক্লাসে—মাত্র দুজন। তারপরেই গ্রীক—ছাত্রসংখ্যা তিনজন। বাঙলা ও ফারশি ক্লাসে ছিলো পাঁচজন ক'রে। অঙ্কনবিদ্যাও শেখানো হ'তো।[৬] পুরস্কারপ্রাপকদের মধ্যে কিষেণচন্দ্র দত্ত, তারে (তারা) নাথ মল্লিক, হরিলাল বসাক, দয়ালচন্দ্র দে প্রমুখের নাম দেখতে পাই।

ড্রামণ্ড প্রবর্তিত বার্ষিক পরীক্ষা-ব্যবস্থা শুধু অভিনব নয়, ছেলে-শিক্ষক-অভিভাবকদের কাছে পালাপার্বণের মতোই আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিলো। তখন পরীক্ষা নেওয়া হ'তো প্রকাশ্যে সর্বসাধারণের সামনে—পরীক্ষকেরা ছিলেন বহিরাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। তাঁদের মধ্যে একজন পরীক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতেন। উত্তর সঠিক হ'লে তুমুল হর্ষ এবং কর-ধ্বনির মধ্যে ছাত্রটি অভিনন্দিত হ'তো। পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা ছিলো। বুককীপিং পরীক্ষাতেও বেশ রোমাঞ্চ ছিলো। শহরের নামজাদা হিসাবপরীক্ষক লেজার পোস্টিং-এর কাজ দিতেন। হলে ব'সেই সেটি করতে হ'তো। আমাদের ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেই দিনগুলিতে যখন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হ্যালিফ্যাক্স প্রশ্ন করছেন কিশোর ডিরোজিওকে। আর ঠিক জবাব দেবার সঙ্গে সঙ্গে সপ্রশংস করতালি, ডিরোজিও তাঁর শ্রদ্ধাভাজন গুরু ড্রামণ্ডের কাছ থেকে পদক গ্রহণ করছেন। আবৃত্তি এবং অভিনয়েরও ব্যবস্থা থাকতো। এ ব্যাপারেও ডিরোজিও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন ড্রামণ্ড। বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারেও তিনি দরাজভাবে পয়সা খরচ করতেন। তিনি জানতেন যে বার্ষিক পরীক্ষা অথবা পুরস্কার বিতরণী সভা অন্য সামাজিক অনুষ্ঠানের মতোই—মহিলার

উপস্থিতি ছাড়া শোভাহীন। তাই তিনি তাঁর এক বান্ধবীকে বল নাচের আসর এবং ভোজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সদলবলে বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের দিন উপস্থিত হ'তে রাজি করান।

ডিরোজিওর সঙ্গে 'ধর্মতলা একাডেমি'র যোগাযোগ কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। মৃত্যুর নয়দিন আগেও তিনি তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলেন পরীক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (দ্বিতীয় খণ্ড)-য় নিম্নলিখিত খবরটি পাই :

২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮

ধর্ম্মতলা একডিমি।—১৭তারিখে ইহার পরীক্ষা দর্শান অনেক সাহেব বিবি ও হিন্দু লোক এবং শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর আগমন করিয়াছিলেন এবং ইমতেহান ডাক্তর এডম ও মেষ্টর ডিরোজিউ সাহেব কর্ত্তৃক নীত হইল। আর ছাত্রদিগের "এক্ট ও স্পিচ" ইত্যাদি অবলোকন করিয়া আমোদিত হইলেন।

এবার আমরা একটি বিতর্কিত প্রশ্নে আসি। ড্রামণ্ড কি নাস্তিক ছিলেন? তাঁর স্কুলে কি নাস্তিক্যবাদ শিক্ষা দেওয়া হ'তো? টমাস এডওয়ার্ডস বলেছেন যে ড্রামণ্ডের স্কুলের জনপ্রিয়তা ক'মে যাবার অন্যতম কারণ হ'লো ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা-পদ্ধতি। তিনি তাঁর গ্রন্থে এরকম ইঙ্গিত করেছেন যে আর্চডেকন ডিয়ালট্রির নেতৃত্বে যাজকসম্প্রদায় মোটামুটি সার্কুলার রোডে অবস্থিত একটি বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, যেটি নাকি কলকাতার একমাত্র স্কুল যেখানে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা দেওয়া হয় ব'লে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরতো।[৭] বিনয় ঘোষ তাঁকে একেবারে 'ঘোর সংশয়বাদী' বলেছেন। তিনি তাঁর 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' গ্রন্থে লিখেছেন :

ঈশ্বর যদি কেউ থাকেন তো থাকুন, যাঁদের অফুরন্ত অবসর আছে তাঁরা স্বর্গলোক কোথায় তার হদিশ করুন, কিন্তু ইহজীবনে মানুষই ঈশ্বর। মানুষই তার সর্বময় প্রভু, এবং মানবচিন্তাই ঈশ্বরচিন্তার নামান্তর। মানুষের চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই পৃথিবীতে। ঘোর সংশয়বাদী ও যুক্তিপন্থী ড্রামণ্ড একথা কেবল যে বন্ধুদের বা সমদর্শীদের বলতেন তা নয়, মধ্যে-মধ্যে ছাত্রদেরও শোনাতেন, এবং ছাত্রদের কর্ণেই যে কেবল তা প্রতি-ধ্বনিত হত তা নয়, কিঞ্চিৎ রেশ তার মর্মেও পৌঁছত।

(ঐ, দ্বিতীয় সং, পৃ ৩১)

কী ভিত্তিতে বিনয় ঘোষ এই মন্তব্য করেছেন জানি না। কেননা ক্লাসঘরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করলে সেযুগে কোনো হিন্দু পড়তো কিনা সন্দেহ। অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কেও একই কথা বলে চলে। ড্রামণ্ডশিষ্য ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে কর্মচ্যুত করার সময়ে একটি অভিযোগ ছিলো যে তিনি নাস্তিক। কলেজে, যেখানে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্ররা পড়ে, সেখানেই যদি এরকম হুলস্থুল কাণ্ড হ'তে পারে তো বিদ্যালয়ে আরো আলোড়ন হবে, এটাই স্বাভাবিক। সেযুগের সংবাদপত্রগুলিতে স্কুল-কলেজগুলি সম্পর্কে যেসব খবর বেরতো তাতে মাঝে মাঝে এরকম মন্তব্য থাকতো অমুক স্কুলে নাস্তিকতা শিক্ষা দেওয়া হয় না। বস্তুত এ বিষয়ে অভিভাবক-সম্পাদক সবাই খুব সতর্ক ছিলেন। প্রসঙ্গত 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' প্রসঙ্গে একটি খবর উদ্ধৃত করছি। এটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'-র দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৮ ফাল্গুন ১২৩৮

...আমরা অনুমান করি এই স্কুলের ক্রমে উন্নতি হইতে পারিবেক যেহেতুক প্রায় তিন বৎসর হইল স্থাপন হইয়াছে এ পর্যন্ত কোন বালকের নাস্তিকতা কলঙ্ক রাষ্ট্র হয় নাই এজন্য ভদ্র লোক ঐস্থানে বালক পাঠাইতে সন্দিগ্ধ হইবেন না এবং যে সকল পুস্তকাদি পাঠে নাস্তিক হয় তথায় পাঠ হয় না [পৃ ৫৭-৫৮]

বস্তুত আমাদের হাতে যে তথ্য আছে তাতে ড্রামণ্ডের স্কুলে ঈশ্বরে অবিশ্বাসের কথা বলা তো দূরের কথা, তিনি নিজে সংশয়বাদী অথবা নাস্তিক ছিলেন কিনা বলা মুশকিল। পূর্বোক্ত 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে ড্রামণ্ডের জবানবন্দিতে বলা আছে :

আমি ছেলেদের ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষাদানে স্থির সংকল্প। এ যাবৎ এ বিষয়ে খুবই কম মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি তাদের প্রতি রবিবার গির্জাতে নিয়ে যাবো এবং সভ্যতা-ভব্যতা শেখাবো। এটা মিস্টার মেজার অথবা ওয়ালেসের পক্ষে যতোই সংকীর্ণ মনে হক, আমার অহঙ্কারে লাগবে না; এতে শুধু ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যপালনই হবে না, মানুষেরাও তারিফ করবে।[৮]

ড্রামণ্ডের এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয় অখ্রীষ্টান ছাত্রদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিলো না। যাই হোক, স্বয়ং ড্রামণ্ডের সাক্ষ্যে বলা যায় যে তাঁর স্কুল নিয়মশৃঙ্খলার জন্য প্রসিদ্ধ হ'লেও এখানে ধর্মবিরোধী শিক্ষা দেওয়া হ'তো না।

ড্রামণ্ড ছিলেন একই সঙ্গে ভোগবাদী এবং উদার মানবতাবাদী। ভালো থাকা, ভালো খাওয়া, ভালো পরা এগুলিকে তিনি বিশেষ মূল্য দিতেন। 'বুনো রামনাথে'র আদর্শ তাঁকে কখনো অনুপ্রাণিত করেনি। তাঁর জীবনযাত্রা বিষয়ে কিছু বলার আগে তিনি কী ক'রে 'ধর্মতলা একাডেমি'র মালিক হলেন, সেটা জানা দরকার।

ড্রামণ্ড যখন শিক্ষকরূপে যোগ দেন, তখন 'ধর্মতলা একাডেমি'র মালিক ছিলেন মিস্টার মেজারস এবং মিস্টার ওয়ালেস। তদানীন্তন 'ওল্ড লিটল থিয়েটার'-এর স্বত্বাধিকারী মিস্টার মরিস থাকতেন ওয়ালেস-এর সঙ্গে। ওয়ালেস মরিসকে পরামর্শ দিলেন নতুন ক'রে পুরনো থিয়েটারকে চালু করতে যা নয়া থিয়েটারকে ছাড়িয়ে যাবে। ওয়ালেস এই থিয়েটার নিয়ে এমন মেতে উঠলেন যে তিনি ভুলে গেলেন তাঁর প্রাথমিক বৃত্তি শিক্ষকতা। স্কুলের অনেককেই তিনি দলে টানলেন। ড্রামণ্ডকেও নেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মিস্টার মেজারস-এর হস্তক্ষেপে তা আর সম্ভব হয়নি। ওয়ালেস তখন থিয়েটার নিয়ে এতোই মত্ত যে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে তিনি তাঁর মেয়েকে মঞ্চে নামালেন। স্বভাবে তিনি ছিলেন দাম্ভিক, নিজে যেটা ভালো মনে করতেন, সেটাই করতেন। একজন শিক্ষকের মেয়ে মঞ্চাভিনেত্রী—সেযুগে এ নিয়ে নিশ্চয় খুব হৈ চৈ হয়েছিল। অন্তত এই ব্যাপারকে কেন্দ্র ক'রে ওয়ালেস এবং মেজারস-এর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘ'টে যায়। ড্রামণ্ড লিখেছেন যে তাঁর ধারণা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত মেজারসই স্কুল পরিচালনা থেকে স'রে দাঁড়াবেন আর ওয়ালেস একাই মালিক হবেন। তাহ'লে ড্রামণ্ডের চাকরি রাখা মুশকিল হ'তো, কেননা তিনি অভিনয় করতে রাজি না হওয়ায় ওয়ালেস তাঁর ওপর চ'টে ছিলেন। কিন্তু পরে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে ওয়ালেস বিদ্যালয়ের স্বত্ব ত্যাগ করেন। মেজারস-এর সঙ্গে তাঁর আরো চুক্তি হয় যে পরবর্তী দু-বছরের মধ্যে তিনি বঙ্গদেশের কোথাও নতুন স্কুল করতে পারবেন না।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। পূর্বোক্ত ঘটনা থেকে এমন কথা মনে করবার কারণ নেই যে ড্রামণ্ড অভিনয়বিরোধী ছিলেন। বরং ঠিক উল্টো—তিনি আবৃত্তি এবং অভিনয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এ ব্যাপারে ডিরোজিও প্রমুখের হাতেখড়ি ড্রামণ্ডের বিদ্যালয়েই। তিনি তখনকার দিনে তিন হাজার টাকা খরচ ক'রে স্কুলে একটি মঞ্চ নির্মাণ করেছিলেন।

যাই হোক, আমরা আগের ঘটনায় ফিরে আসি। মেজারস ড্রামণ্ডকে ডেকে বললেন যে একা তাঁর পক্ষে স্কুল পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তিনি যদি অংশিদার হ'তে রাজি থাকেন তোকয়েকদিনের মধ্যে তাঁকে জানাতে হবে। ড্রামণ্ড হিশেব

ক'রে দেখলেন যে এর ফলে তাঁর মাসিক আয় দাঁড়াবে পাঁচশো টাকা। মেজারস তাঁকে আরো বলেছিলেন যে এক বছর বাদে তিনি পুরো স্বত্ব কিনে নিতে পারেন। এই হ'লো ড্রামণ্ডের মালিক হবার ইতিহাস। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ড্রামণ্ড অবসর গ্রহণ করলে স্কুলটির অধিকারী হন জনৈক উইলসন। কিন্তু তখনও বিদ্যালয়টি ড্রামণ্ড ও উইলসনের 'ধর্মতলা একাডেমি' নামে পরিচিত ছিলো।

ড্রামণ্ড থাকতেন রাজার হালে। তিনি এণ্টালিতে একটি বাগানবাড়ি কিনেছিলেন। সেখানে দর্শন এবং সাহিত্য-চর্চার সঙ্গে খানাপিনা লেগেই থাকতো। তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বর্ণনা তিনি নিজে দিয়ে গেছেন :

> সকালে একজন বশংবদ চাকর এসে হাজির হয় ঘরদোর সাফ করবার জন্য। আরেকজন দাসের মতো আসে আমার মুখ-হাত-পা ধোবার সময়ে জল ঢেলে দিতে। সে আমার পোশাক পরিয়ে দেয়, জুতোর ফিতে বাঁধে আর খাবার সময়ে টেবিলের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে হুকুম তালিম করতে। প্রাতরাশের পর স্কুলে যাই, দুটো পর্যন্ত সেখানে থাকি। এই হ'লো সারাদিনের কাজ। সান্ধ্যভোজ সারি পাঁচটায়। যদি বাইরে বেরোই তো চারজন অথবা ছয়জন বেহারায় টানা পাল্কিতে চাপি। কোনো ইউরোপীয়ানকে হেঁটে চলাফেরা করতে দেখলে সেটা হবে ক্ষমাহীন অপরাধ। ইউরোপীয় কোট ছাড়া, যেটা এই ঋতুতে পরা চলে, আমার পরনে সব সময়ে সেরা মস্‌লিনের পোশাক—চাকরবাকরদের হাতে ধবধবে ক'রে কাচা। আর আমি রোজই পোশাক পাল্টাই। গরমকালে কেউ কেউ ঘন ঘন পোশাক বদল করে।
>
> এই প্রাচুর্যের দেশে ইউরোপীয়ানরা সবাই সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং মহিলা। তারা তোমার চেয়ে ভালো খানাপিনা করে এবং ঘুমোয়। অর্ধেকটা সময় আমাদের কাটে আমোদপ্রমোদে। এখানে আমরা রাজার মতোই অভ্যর্থনা এবং খাতির পেয়ে থাকি।[৯]

পোশাক-আশাকে ডিরোজিও গুরুর মতোই কেতাদুরস্ত ছিলেন। তাঁর বাড়িতেও নিয়মিত আড্ডা বসতো। তবে গুরুর মতো তাঁর বল নাচ প্রীতি ছিলো কিনা জানা যায় না।

ড্রামণ্ড তাঁর স্কুলে নৃত্যশিক্ষারও প্রবর্তন করেছিলেন। ব্যাপারটি 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এর জীবনী লেখক অনুমোদন করেননি। তাঁর মতে, ছেলেমেয়েদের যৌথ নৃত্যব্যবস্থা ক্ষতিকর। তার ফলে তাদের আগ্রহ লেখাপড়ার চেয়ে অন্য ব্যাপারে বেশি লক্ষ করা যায়। তিনি দেখেছেন, যেসব মেয়েদের

দুধের দাঁত পর্যন্ত পড়েনি, তারাও ছেলেবন্ধুদের স্তোকবাক্য শুনে এমনভাবে 'ছি ছি যাঃ' বলে যে বয়স্কদেরই অধোবদন হ'তে হয়। পরে অবশ্য স্কুল থেকে নৃত্যশিক্ষা উঠে যায়, কিন্তু ইউরোপীয় এবং ইউরেশীয় পরিবারের মধ্যে এর প্রচলন ছিলো। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে 'ধর্মতলা একাডেমি'তে কি পরে সহশিক্ষার প্রচলন হয়েছিল? কেননা পূর্বোক্ত জীবনী লেখকের রচনা থেকে ধারণা হয় ছেলে-মেয়েদের এক সঙ্গেই নাচ শেখানো হ'তো। 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট' (খণ্ড ২৭ ক্রমিক সংখ্যা ৫৩-৪৪, জানুয়ারি-জুন ১৯২৮)-এ জনৈক এইচ. ভব্লু. বি. মনরো লিখেছিলেন যে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ড্রামণ্ডের ২৪ ধর্মতলা স্ট্রীটস্থ স্কুলে স্থাপিত হয় 'ডুপ্যার ডান্সিং অ্যাকাডেমি'।

দেড় দশক পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে বিদ্যালয় চালিয়েছিলেন ড্রামণ্ড। তারপর তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাঁর অবসর নেবার কথা আগেই বলা হয়েছে। এমনিতেই অভিভাবকেরা ক্রমশ ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি বিষয়ে আস্থা হারাচ্ছিলেন। কেননা মালিক অসুস্থ হ'লে অথবা কোনো কারণে অনিয়মিত হ'ল স্কুলের পঠনপাঠন এবং শৃঙ্খলা একেবারে ভেঙে পড়তো। ড্রামণ্ডের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এদেশে ইংরেজ শাসন যতোই কায়েম হচ্ছিলো, পাশ্চাত্যরীতিতে সুশিক্ষার চাহিদা ততোই বাড়ছিল। শুধু চাকরির জন্য লেখাপড়া নয়, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দিকে ঝোঁক দেখা দিলো। ড্রামণ্ড একা হ'য়ে পড়ায় এবং শরীরও অপটু থাকায় নতুন যুগের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিলেন না। তৃতীয়ত, ড্রামণ্ডের স্কুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ইউরেশীয় সম্প্রদায়। তাঁরা ক্রমশ নিজেদের দাবিদাওয়া এবং অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছিলেন। তাঁরা চাইছিলেন এমন শিক্ষাব্যবস্থা যা শুধু অর্থকরী নয়, আধুনিক যুগের উপযোগী। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই এই দিকে ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ জন মিলার রিকেটস-এর উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দ্য পেরেন্টাল একাডেমি'। উদ্যোক্তাদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর কয়েকজন একই বছরে স্থাপন করলেন 'দ্য ক্যালকাটা গ্রামার স্কুল'। ক্রমে ক্রমে এরাই ড্রামণ্ডের স্কুলের প্রতিপক্ষ হ'য়ে দাঁড়ালো। অবশেষে মাস্টার্স পরিচালিত 'ভেরুলাম একাডেমি'র সঙ্গে 'ধর্মতলা একাডেমি' মিলিত হয়। কিন্তু মাস্টার্স 'লা মার্টিনিয়ার'-এর প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হ'লে পূর্বোক্ত বিদ্যালয়টি উঠে যায়।

'দ্য ক্যালকাটা গ্রামার স্কুল' সে যুগে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই

স্কুলে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং দেশীয় ভাষা পড়ানো হতো। এর বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে আছেন সি. জে. মণ্টেগু, যাঁর লেখা ড্রামণ্ডের জীবনী বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান উপকরণ। তাঁর অন্যান্য রচনা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। তিনি পরে ঐ স্কুলেরই শিক্ষক হন। মণ্টেগু লিখেছেন যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও তাঁর এবং লরিমর-এর চেষ্টায় স্কুলটি ভালোই চলছিল। তাঁদের প্রধান প্রতিযোগী ছিলো 'লা মার্টিনিয়ার' (প্র. মার্চ ১৮৩৬)।

ড্রামণ্ড শিক্ষাক্ষেত্র যেতে অবসর নেবার কিছু আগে আগমন হ'লো আলেকজাণ্ডার ডাফের। ডাফ-ড্রামণ্ড পরস্পরের কতটা পরিচিত ছিলেন জানি না। কিন্তু ডিরোজিও-ডাফের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ না হ'লেও 'ইয়ং বেঙ্গল' দলকে কেন্দ্র ক'রে স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হ'লো। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ডিরোজিওর একাধিক শিষ্য ডাফের কাছে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক ডাফ কতটা সফল তা নিয়ে মতভেদ হ'তে পারে, কিন্তু বাইবেল অবশ্যপাঠ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্কুলগুলির জনপ্রিয়তা তুলনাহীন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের চার্চ বিভক্ত হ'লে ডাফ নিমতলায় 'ফ্রী চার্চ ইন্‌স্টিটিউশন' স্থাপন করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তার ছাত্রসংখ্যা বলা হচ্ছে ১৪০০।

যাই হোক, নানা কারণে শিক্ষার জগৎ থেকে ধীরে ধীরে স'রে গেলেন ডেভিড ড্রামণ্ড। শিক্ষক ছাড়াও স্বাধীন চিন্তাবিদরূপে ড্রামণ্ডের খ্যাতি ছিলো। তিনি কিছুদিন 'ক্যালকাটা ফ্রেনোলজিক্যাল সোসাইটি'র উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর প্যাটারসনের উদ্যোগে এর প্রতিষ্ঠা হয়। ড্রামণ্ড কিন্তু শিগ্‌গিরই এই ফ্রেনোলজির চর্চায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। পূর্বোক্ত সোসাইটিতে পঠিত কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি এই বিষয়ে তাঁর আপত্তি লিপিবদ্ধ করেন, যেটি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ফ্রেনোলজিক্যাল সোসাইটি বিষয়ে বিশদ বিবরণ টমাস এডওয়ার্ডস-এর ডিরোজিওর জীবন চরিতে পাওয়া যাবে।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দেই ড্রামণ্ড স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সিঙ্গাপুরে যান। ঠিক কতদিন তিনি ওখানে ছিলেন বলা মুশকিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর স্কুলের হস্তান্তর হয়। সেই সময়ে তাঁর কলকাতায় থাকাটাই স্বাভাবিক। একই বছরে ২৬ ডিসেম্বর ডিরোজিওর মৃত্যু হয়। কিন্তু তখনকার যে কয়টি পত্র-পত্রিকায় ডিরোজিওর শোকসভার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ড্রামণ্ডের উপস্থিতির কোনো উল্লেখ নেই। কলকাতায় থেকেও তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্রের শোকসভায় থাকবেন না, এটা অবিশ্বাস্য। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই ইউরোপীয় সম্প্রদায় পার্লামেণ্টে দ্বিতীয়

আবেদন পাঠাবার জন্য টাউন হলে সভা করেন। জে. ডব্লু. রিকেটস সভাপতি ছিলেন আর প্রধান বক্তা ডিরোজিও। এই সভায় ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ড্রামণ্ড উপস্থিত ছিলেন দেখতে পাই। ডিরোজিও বিষয়ে তিনি যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তা-ও অনেক পরে—তাঁর সম্পাদিত 'উইকলি এগজামিনার' কাগজের ১৬ অগাস্ট এবং ২৬ সেপ্টেম্বর (১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের) সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত হয়। এই রচনাটি একমাত্র ইলিয়ট ওয়ালটার ম্যাজ ছাড়া ডিরোজিওর আর কোনো জীবনীকার দেখেননি। তিনি তাঁর বইতে এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন মাত্র। তাতে প্রিয় ছাত্র বিষয়ে একটি লাইন আছে, ডিরোজিও ছিলেন 'The pride of his countrymen and the darling of all who knew him'

স্কুলটি উঠে যাওয়ায় বেশ আর্থিক অসুবিধার মধ্যে পড়লেন ড্রামণ্ড। ভোগবিলাস এবং দানধ্যান—উভয় ব্যাপারেই তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট তাঁর 'হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ' ('ফারশি ব্যাকরণ' লিখেছেন টমাস এডওয়ার্ডস এবং বিনয় ঘোষ)-এর উৎসর্গপত্রে ডেভিড ড্রামণ্ড বিষয়ে লিখেছেন, 'যিনি প্রাচ্যের ভোগবিলাসের মধ্যে অত্যন্ত সার্থকভাবে মেটাফিজিক্স এবং স্কটল্যাণ্ডের কাব্যদেবীর চর্চা করেছেন'। কিন্তু অভাব এবং অসুখ তাঁর জীবনযাত্রা বদলে দিলো। জনপ্রিয় মানুষটি ক্রমশই নিঃসঙ্গ হ'য়ে পড়ছিলেন। তার্কিক হিশেবে বিভিন্ন বিতর্কসভায় প্রায়ই তাঁর ডাক পড়তো। তিনি সুবক্তা ছিলেন, যদিও সমসাময়িক সাক্ষ্যে বলা যায় তিনি পরমত অসহিষ্ণু ছিলেন। তবে তাঁর মতো বাগ্মিতার খ্যাতি ডিরোজিওর ছিলো না। ডিরোজিওর মতামত যুক্তিপূর্ণ ছিলো, বক্তব্য স্পষ্ট ছিলো, কিন্তু ড্রামণ্ড অনর্গল ব'লে যেতে পারতেন। সব মিলিয়ে ড্রামণ্ড ছিলেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তি।

শরীর একটু ভালো হ'লে ড্রামণ্ড জীবিকানির্বাহের জন্য পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প করলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'দ্য উইকলি এগজামিনার' প্রকাশিত হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে বেশিদিন চালাতে পারেননি ড্রামণ্ড। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পত্রিকাটি বন্ধ হ'য়ে যায়। টমাস এডওয়ার্ডস লিখেছেন যে 'উইকলি এগজামিনার' বেরোয় ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'-র দ্বিতীয় খণ্ডে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা থেকে নিম্নলিখিত খবরটি সংকলিত হয়েছে ঃ

২১ মার্চ ১৮৪০। ৯ চৈত্র ১২৪৬

[ধর্ম্মতলার একাডিমিক নামক বিদ্যালয়ের পূর্ব অধ্যক্ষ]

মেষ্টর ড্রামণ্ড সাহেবের সাপ্তাহিক একজামীনের এবং কলিকাতা লেটরারি রেজেষ্টর নামক অভিনব সংবাদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা অবলোকন করিয়াছি।

পত্রিকাটি সুগৃহীত হয়েছিল মনে হয়। শুরুতে পাঁচশো জন গ্রাহক হন। লেখক তালিকায় মোটামুটি নিয়মিত ছিলেন ড্রামণ্ডের দুই বন্ধু, ডক্টর জন গ্র্যাণ্ট এবং ডি. এল. রিচার্ডসন। কিন্তু 'ইংলিশম্যান'-এর তৎকালীন সম্পাদক স্টকলার ড্রামণ্ডের পত্রিকাকে সুনজরে দেখেননি। একবার স্টকলার-এর থিয়েটার বিষয়ক প্রবন্ধ সম্পর্কে ড্রামণ্ড কটাক্ষ করলে তিনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে গ্রাহক থাকতে অস্বীকার করেন।

টমাস এডওয়ার্ডস-এর মতে, পত্রিকাটি জনপ্রিয় হয়নি। কেননা ড্রামণ্ডের ভাষা ছিলো মার্জিত, শাণিত—সাধারণ পাঠকের উপযোগী নয়। সংবাদপত্রের গ্রাহকেরা চাইতো উত্তেজনা—প্রথম আফগান যুদ্ধের তখন অন্তিম অবস্থা। লোকেরা সাগ্রহে টাটকা খবরের আশায় থাকতো। কিন্তু নতুন খবর সংগ্রহের সামর্থ্য ড্রামণ্ডের ছিলো না, তিনি বাসি খবরের ওপর টীকা-টিপ্পনী লিখতেন। তাছাড়া তথ্যের চেয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর উৎসাহ বেশি ছিলো। পত্রিকাটি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এ-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা মুশকিল। তবে ম্যাজ জোরের সঙ্গে বলেছেন যে টমাস এডওয়ার্ডস 'উইকলি এগজামিনার' দেখেননি।

পত্রিকাটি উঠে গেলে ড্রামণ্ডের গ্রাসাচ্ছাদন চলতো 'হরকরা' পত্রিকায় লিখে। তাঁর দুই বন্ধু জন গ্র্যাণ্ট এবং ডি. এল. রিচার্ডসন তাঁকে আর্থিক সাহায্য দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ড্রামণ্ডের আত্মমর্যাদাবোধ এমন প্রখর ছিলো যে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত ড্রামণ্ডের চরিতকার তাঁর শেষ জীবনের একটি অন্তরঙ্গ বর্ণনা দিয়েছেন। ড্রামণ্ডের সময়ে ফাউন্টেন পেনের প্রচলন ছিলো না। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে উক্ত লেখক এবং তাঁর বন্ধু ড্রামণ্ডের সঙ্গে যখন দেখা করতে যান, তখন তিনি 'হরকরা'-র জন্য লেখায় ব্যস্ত। তাঁদের দেখে ড্রামণ্ড বললেন, 'দৃষ্টিশক্তি এখন ক্ষীণ ; এ কাজের আমি আর যোগ্য নই। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বেচারা আমার কলমগুলি বানায়। কিন্তু কোনো সুদক্ষ কারিগর যদি এমন কলম তৈরি করতে পারতো যাতে এখনকার চেয়ে অনেক বেশিক্ষণ কলমে কালি থাকে! যখনই দোয়াতদানিতে কলম ডোবাই, আমার চিন্তার স্রোত ব্যাহত হয়—ধারাবাহিকতা থাকে না আর আমি অনুভব করি যে ছিন্নসূত্র জোড়াতালি

দিতে আমি অক্ষম'। ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বর্ণনা শুনলে কেমন যেন মনে হয়।

চোখের আড়াল থেকে মনের আড়ালে চ'লে গিয়েছিলেন ডেভিড ড্রামণ্ড। তাঁকে শেষবারের মতো সাধারণ্যে দেখা যায় তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে টাউন হলে। উপলক্ষ ছিলো মেকানিক্স ইন্‌স্টিটিউটের বার্ষিক সভা। প্রধান বক্তা ছিলেন জর্জ টমসন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এদেশে জর্জ টমসনকে নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন পার্লামেন্টের সদস্য এবং ভারতহিতৈষী নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। উইলিয়াম অ্যাডাম প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র তিনি সদস্য ছিলেন। এছাড়া তিনি তাঁর সম্পাদিত 'বৃটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাডভোকেট' পত্রিকায় ভারতবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে জনমত সংগঠনে বিশেষ প্রয়াসী হন। এদেশে টমসনের ভূমিকা বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু সেযুগে তিনি বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষত ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিলেন। তাঁর বাগ্মিতাও ছিলো অসাধারণ। যাই হোক, পূর্বোক্ত সভায় টমসনই ছিলেন প্রধান আকর্ষণ—ড্রামণ্ডকে কে আর মনে রেখেছে? ড্রামণ্ড যখন বক্তৃতা দিতে উঠলেন, তখন চাপা গলায় গুঞ্জন শোনা গেলো, কে ইনি? নতুন প্রজন্ম ড্রামণ্ডকে দেখেনি, তাঁর নামও শোনেনি। ড্রামণ্ডেরও সেই বাগ্মিতা আর নেই, গলার জোরও নেই। মৃত্যুর আগের দিন ড্রামণ্ডের ছাত্র ও বন্ধু এইচ. বি. গার্ডেনার তাঁকে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানেই ছাপ্পান্ন বছর বয়েসে তাঁর জীবনাবসান হয়। সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় একটি যুগের।

ড্রামণ্ডের সমাধিফলকে তাঁর নানা গুণাবলির উল্লেখ থাকলেও কবি-পরিচয়ের কথা বলা হয়নি। কিন্তু তিনি আজীবন কাব্যচর্চা ক'রে গেছেন। স্কটল্যাণ্ডে থাকতেই তাঁর কাব্যচর্চার শুরু। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন যে, বহু জনপ্রিয় স্কটিশ সঙ্গীত যা তখনকার দিনে লোকেদের মুখে মুখে ফিরতো তা তাঁরই রচনা। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন দেশে থাকতে যেসব কবিতা তিনি লিখেছিলেন সেগুলি লণ্ডনে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য। ভারতে আসবার সময়ে জাহাজেও তিনি কবিতা-গান রচনার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেননি। এদেশে একটু গুছিয়ে বসেই তিনি আবার কাব্যচর্চা শুরু করেন। একটি কবিতাসংগ্রহের পাণ্ডুলিপি তিনি জাহাজ ডাকে পাঠিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডে ছাপা হবার জন্য। কিন্তু জাহাজটি জলমগ্ন হওয়ায় সেই পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়।

সংবাদপত্রের মুক্তিদাতা চার্লস মেটকাফ-এর উদ্দেশ্যে ড্রামণ্ড 'হরকরা' পত্রিকায় একটি প্রশস্তি-কবিতা লিখেছিলেন। ডি.ডি. স্বাক্ষরিত এই কবিতাটি মেটকাফ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একদিন তাঁর এ. ডি. সি. 'হরকরা' সম্পাদক স্মিথের কাছে ড্রামণ্ডের প্রকাশিতব্য কবিতার বইয়ের পঞ্চাশ কপির অগ্রিম মূল্য দিয়ে যান। কিন্তু এই কবিতার বই শেষ পর্যন্ত বেরোয়নি। বিনয় ঘোষ অবশ্য লিখেছেন যে এটি প্রকাশিত হয়।

'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এর জীবনীকার দাবি করেছেন যে ডিরোজিওর 'ফকীর অব জঙ্গীরা'র অনেক সংশোধন এবং সংযোজন ড্রামণ্ডের। শেষ বয়েসে তিনি উক্ত কাব্যগ্রন্থ থেকে আবৃত্তি ক'রে আনন্দ পেতেন। ছাত্রের রচনা শিক্ষক সংশোধন ক'রেই দিতে পারেন। তবে এই কথা তাঁর আর কোনো জীবনীকার বলেননি। ডিরোজির গ্রন্থেও কোনো স্বীকৃতি নেই। তবে এটা খুবই স্বাভাবিক যে ডিরোজিওর কবিত্বের উন্মেষ ড্রামণ্ডের স্কুলে হয়েছিল।

রিচার্ডসন ড্রামণ্ডের বন্ধু হ'লেও তাঁর কবিতার কি অনুরাগী ছিলেন? মনে হয় না। কেননা তাঁর *Selections from the British Poets: from the time of Chaucer to the present Day* (*1840*) নামক বৃহৎ সংকলনে ড্রামণ্ডের কোনো কবিতা স্থান পায়নি। ভারতীয়দের মধ্যে আছেন দুজন—ডিরোজিও এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষ। এছাড়া ভারতপ্রবাসী বহু ইংরেজ কবির কবিতা এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। ড্রামণ্ডের কবিতা আজ প্রায় দুর্লভ। সেজন্য একটি কবিতা নীচে উদ্ধৃত হ'লো:

LINES TO THE MEMORY OF ROBERT BURNS

Poor luckless child! to thee was given
To prove the just behests of heaven;
For though in dark misfortunes of gloom,
On bleakest waste, 'twas thine to bloom,
Bursting through every cloud of fate,
Thou soar'd'st above the pamper'd great,
And spread'st, amid their haughty ring,
The sweetest note, the wildest wing.
Yet though thy country hailed with pride,
Thy swelling soul: and drank its tyde,

Imbibed, with rapture, all the store
Thy true and tender hearth could pour —
Though "quick to learn—and wise to know,"
The only meed was want and woe !
But through the shades of dread repose
Thy "narrow house" for ever close—
Though mute for aye thy magic lyre ;
And ever fled thy soul of tire—
While freedom has a spark to warm,
Or beauty has a beam to charm,
And when the sons of wealth and pride,
Who passed thee by with heedless stride,
Are mouldered in oblivious urns,
Thy name shall live — neglected Burns
Thy darling lays, in every clime,
Shall mock the power of wasting time,
And Scotia's proudest banner wave
Triumphant, o'er thy hallowed grave.

ডিরোজিও ছয় থেকে চোদ্দো বছর পর্যন্ত ড্রামণ্ডের স্কুলে পড়েছিলেন। শিষ্যের ওপর গুরুর প্রভাব গভীর হ'লেও ডিরোজিও-র স্কুলজীবন সম্পর্কে তথ্য খুব সামান্য। আমরা আগেই লক্ষ করেছি যে, ডিরোজিও স্কুল থেকে বেরিয়ে যাবার পরেও 'ধর্মতলা একাডেমি'র বার্ষিক পরীক্ষায় এসেছেন। কিন্তু ডিরোজিও প্রবর্তিত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' বা অন্যান্য বিতর্কসভায় ড্রামণ্ড কখনো যোগ দিয়েছেন কিনা বলা মুশকিল। ড্রামণ্ডের ডিরোজিও বিষয়ক রচনাটি উদ্ধার করা গেলে হয়তো নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যেতো। তবে অন্যান্য সংবাদপত্রসূত্রে যেটুকু জানা যায় যে ডিরোজিও অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অভিনয়, আবৃত্তি, খেলাধূলা সব কিছুতেই তাঁর আগ্রহ ছিলো। সহপাঠীদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ প্রায় সব জীবনীকারেরাই করেছেন। একবার দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ডিরোজিও স্কুলে গেলে তাঁকে দেখে ছেলেরা উল্লসিত হ'য়ে হুড়মুড় ক'রে ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসে। পাশেই ক্লাস নিচ্ছিলেন ড্রামণ্ড। অন্য সময়ে হ'লে তিনি এরকম শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধ বরদাস্ত করতেন না। কিন্তু উপলক্ষ যেহেতু ডিরোজিও, সেজন্য তিনি হাসিমুখে ক্ষমা করলেন।

ডক্টর জন গ্র্যান্ট 'দ্য ক্যালকাটা লিটেরারি গেজেটে' (১০ নভেম্বর ১৮৩৩) একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে ডিরোজিও ছাত্রাবস্থায় (জানুয়ারি ১৮২৪) একটি স্বরচিত নাটকের প্রস্তাবনা পাঠ ক'রে সবাইকে মুগ্ধ করেন। তাঁর উচ্চারণ ছিলো বিশেষভাবে মার্জিত এবং শুদ্ধ।

তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে চার্লস পোট সেযুগে প্রতিকৃতিশিল্পীরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অঙ্কিত প্রতিকৃতির মধ্যে চার্লস মেটকাফ এবং ডেভিড হেয়ারের ছবি আজো সংরক্ষিত আছে। প্রথমটি পাওয়া যাবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে, দ্বিতীয়টি হেয়ার স্কুলে। তিনি পরে ঢাকার পোগোস স্কুলের হেডমাস্টার নিযুক্ত হন। ঢাকার আর্মেনিয়ান গির্জায় তিনি শেষভোজের একটি ছবি আঁকেন। সেটি এখনো আছে কিনা জানি না। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকাতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর আঁকা ছবিগুলি তিন হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছিল। তার মধ্যে হয়তো ড্রামণ্ডের কোনো প্রতিকৃতি থাকলেও থাকতে পারে।

দানধ্যানের জন্য খ্যাত ডি সুজা পরিবারের ছেলেরাও ডিরোজিওর সঙ্গে পড়তেন। লর্ড রেটিঙ্ক ও অকল্যাণ্ডের এ. ডি. সি. কর্নেল জন বাইর্ন-এর ভাই ওয়েলও তাঁর সতীর্থ। কার্লাইলের প্রেমিকা ইউরেশীয় রূপসী কিটির জ্ঞাতিভাই উইলিয়াম কর্কপ্যাট্রিকও একই ক্লাসে পড়তেন। যোগেশচন্দ্র বাগল ডিরোজিও-র সহপাঠীরূপে জনৈক হরকুমার ঠাকুরের কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি।

পরিশেষে ড্রামণ্ডের চেহারা বিষয়ে একটা কথা বলা দরকার। তাঁর প্রায় সব জীবনীকারেরা লিখেছেন যে তিনি ছিলেন 'কুঁজো'। কিন্তু পূর্বকথিত 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় এই বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। বরং বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে ড্রামণ্ডের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, 'Light and elastic, with the vigor of youth, a pleasing countenance and brilliant blue eyes, Drummond was the hero of the day.' এখানে 'elastic' শব্দটি সন্দেহ জাগায়, কোনো ন্যুব্জ দেহ প্রসঙ্গে একথা কি বলা যায়? তাছাড়া ড্রামণ্ডের শিক্ষকজীবনের গোড়ায় ওয়ালেস যখন তাঁকে অভিনয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন, সেটা কি ঐ শারীরিক বিকৃতি সত্ত্বেও?

আজ আর এর মীমাংসা সম্ভব নয়। ড্রামণ্ডের কোনো প্রতিকৃতি যদি কখনো পাওয়া যায়, তাহ'লে এর উত্তর পাওয়া যাবে। তবে প্রতিকৃতি ছাড়াই ড্রামণ্ড স্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন আমাদের মনে।

উল্লেখপঞ্জি

১ "Before leaving Europe, I intended to have written you though only to say, Farewell. But from the state of mind I was in, at that time, I found I could not address you with sufficient temper, and might have made a breach which could not have been easily healed, and not that a little time has soothed every painful recollection, I am entirely satisfied that I acted prudently.

"True we did not part like brothers, who were very likely to meet no more. But I will not agitate that question. We would still have jarring opinions. Let them rest. The ties of consanguinity are sacred and from no feeling heart can they ever be totally divested."

২ 'The Educational Establishments of Calcutta', *The Calcutta Review*, vol. XIII, January-June 1850. এই অস্বাক্ষরিত রচনাটিও লেখক সি. জে. মণ্টেগু।

৩ 'ডিরোজিও', যোগেশচন্দ্র বাগল, কলকাতা ১৯৭৬, পৃ ২০।

৪ *A Lecture on the Life of Ramgopal Ghosh*, Koylas Chandra Bose, Calcutta, 1868, p 6.

৫ দ্র : *Social Ideas and Social Change in Bengal (1818-1835)*, A. F. Salahuddin Ahmed, 2nd edition, Calcutta, p 45.

৬ Examination in Classes Pupils

English	1st and 2nd	29	Reading, Spelling and Catechism.
Ditto	3rd	29	Will read and resolve the parts of speech.
Ditto	4th	31	Will read and parse, and analyse, any passage in the English language.
Latin	1st	27	Will read, and parse from Rudiments Pietatis.
Ditto	1st and 3rd	14	Will read, parse and analyze Extracts from the New Testament and from Cornelius Nepos.

Greek	...	3	Will read from Moore's Grammar.
French	...	5	Will read and parse from Telemaque.
Bengallee and Persian	...	5	Will read, parse and exhibit specimens of writing.
Arithmetic and Book-Keeping	1st	17	Will transact and post any simple question.
Ditto, and ditto	2d	16	Will transact (by means of counters) anything that may occur in merchandize and post the same by double entry in all the Books.
Geography	1st	27	Elements and definitions.
Ditto	2nd	26	Elements and definitions of Geography and Astronomy.
Geography and Astronomy	...	23	Will solve Problems on the Terrestrial and Celestial Globes and demonstrate by the Orrery.
Geometry	...	16	Will demonstrate propositions from Euclid.
Trigonometry and Algebra	...	2	Will resolve simple Equations.
Drawing	...	9	Specimens will be exhibited.

Op. Cit. Das Gupta, p 168

৭ "The clerical party in Calcutta, headed by Archdeacon Dealtry, if it did not found, at least patronized, a school in the Circular Road, which professed in newspaper advertisements to be "the only school in Calcutta where a Chrfstan education could be obtained". This coupled with the secular system pursued in the Dhurrumtollah Academy, and the absence of its moving spirit, began to tell in popular estimation against Drummond's school ;"

Henry Derozio The Eurasian Poet, Teacher and Journalist, Thomas Edwards, 2nd edition, Calcutta, 1980, p-15.

৮ "I am determined to pay every attention to the religions and moral instruction of the boys — which has as yet been little attended to. I will take them to Church with me on Sunday, and assume every decency of demeanour : this, too mean either for Mr. Measurer or Wallace, will not hurt my pride ; and while it will be fulfilling my duty towards Good, will also be well conceived in the opinion of men."

৯ "To let you know my style of living, in the morning a servant appears with the utmost submission, and cleans my room &c. Another, in the attitude of a slave, pours out water while I wash myself, dresses me, ties my shoes, stands behind me at table and is ready at every call. After breakfast we go into the school until 2 o'clock, which is all the day's labor. Dine at 5 ; if I go abroad I am carried by four sometimes by six men, in a palanquin :—a European seen walking is a crime unparadonable. Except a Europe coat, which can be worn in this season, my dress is of the finest muslin, washed by men extremely white, and then, I shift entirely every day. In the hot season some people shift frequently.

"In this prolific country Europeans are all ladies and gentlemen. They eat, drink and sleep better than you. We spend the half of our time in sport. We are attended and received like kings."

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচে : সংবাদপত্র না সংবাদ

মানসী দাশগুপ্ত

সাংবাদিকের স্বাধীনতা বিষয়ে সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই অনেক কথা শুনতে পান। এই একটি স্বাধীনতা সম্পর্কে অন্তত আমরা অবহিত কেন না ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসে পৌছনোর আগে থেকে অদ্যাবধি, স্বাধীনতা এসে পৌছনোর এতকাল পরেও দক্ষিণ বাম সকল পক্ষই এ নিয়ে বিস্তর বলাবলি করে চলেছেন। পশ্চিম দেশ, যেখান থেকে আমাদের সবরকম স্বাধীনতার ভাবনা ধারণার প্রধান আমদানি, এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশ উচ্চকণ্ঠ বলেই সম্ভবত এটা চলছে এবং যতদূর ধরা যায়, চলবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেবলি কে হরণ করে নিচ্ছে, সাংবাদিকের কণ্ঠরোধ হয়ে যাচ্ছে এ উদ্বেগ নিতান্ত অকারণ বা অমূলক নয়। এইরকম আশঙ্কার মূলে উপলব্ধিটা এই যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (যেটা ইংরেজির ফ্রীডম অব প্রেসের যথাযথ বাংলা অনুবাদ বলে গৃহীত) না-থাকলে গণতন্ত্র বলে কিছু থাকে না ; তা ছাড়াও যে কোনো বৃহৎ সামাজিক উদ্যোগেই ব্যবস্থাপনাকে সৎ রেখে ঠিকঠাক চালাতে হলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একদম অক্ষুণ্ণ রাখা দরকার। কথাটা পুরোপুরি দু-ভাগ মিলিয়েই সত্যি হতে পারে ; অন্তত এটুকু সত্যি হতে কোনো বাধাই নেই যে সংবাদপত্র যেহেতু গণজীবনের দর্পণ, সাধারণের 'মূঢ়, ম্লান, মূক মুখের' ভাষাই ফুটে ওঠে সংবাদ-দর্পণে সেইজন্য সে দর্পণ একদম খোলামেলা নির্বাধ না হলে জনগণ ফুটে উঠতে বাধা পায়। আবার, অন্য দিকে এও কি সত্যি নয় যে সাংবাদিকের তীক্ষ্ণ চোখের আলো ফেলতে না দিলে যে-সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকর্মের প্রকল্প সকলের স্বার্থে হাতে নেওয়া হচ্ছে তাতে নানা

বিঘ্ন জমে উঠে, কাজ থেমে যায়, এমন-কি বহু উদ্যোগে জনস্বার্থবিরোধী ঝোঁক আসে? সাংবাদিককে অতঃপর বিপদসংকেত বাজাতে দেওয়া শুধু যুক্তিযুক্ত নয় জরুরি প্রয়োজন হতে পারে, তাই নয়? হ্যাঁ, তাই। এ পর্যন্ত কথাটা পুরোই ঠিক। কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তা স্বতঃসিদ্ধ কিনা প্রশ্ন তোলাও আবার কম জরুরি নয়; যেমন কম জরুরি নয় জানতে চাওয়া যে গণজীবনের সঙ্গে সংবাদপত্রের তথা সাংবাদিকের সাক্ষাৎ সম্পর্ক কতখানি।

ধরুন, পৃষ্ঠার পরে পৃষ্ঠা নানা বিজ্ঞাপন: একটুখানি "ব্যাভিচার যন্ত্রে ব্যাভিচার তন্ত্রে (বই)"র সঙ্গে পাতার সিকিভাগ করে জায়গা জুড়ে "ভোল্টাস রেফ্রিজারেটর, এর জুড়ি নেই" আর "আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র", এইসব কি দেশের জনগণের কথা? আমাদের জনস্বার্থে, গণস্বাস্থ্যের সুবাদেই কি এ সব দৈনিক সংবাদপত্র সরবরাহ করে করে যায়? আবার দেখুন, সর্বসাধারণিক কর্মোদ্যোগকে অব্যাহত এবং সঠিক পদক্ষেপে অদম্য রাখার জন্যই অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা ব্যস্ত এ কথা ধরে নিয়েও কি বোঝা সহজ হয় যে ভালো ফিল্ম ঠিকমতো তোলা আর চালানোর সঙ্গে ফিল্মজগতের কে কার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট রয়েছেন কে-ই বা তেমন কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্কের হাঙ্গামে জড়িয়ে নেই এই খবর খোঁজার যোগ ঠিক কী? হয় না কিন্তু, এটা বোঝা শক্তই হয়ে থাকে। আরো ধাঁধাই লাগে যখন খেয়াল করে দেখি যে ত্রিশের দশক থেকে চল্লিশের দশকের বাংলা ছায়াছবি যখন কতকটা রমরমার দিকে এগোচ্ছিল, টালিগঞ্জ আকর্ষক হয়ে উঠেছিল যেমন সঙ্গীতশিল্পী তেমনি সাহিত্যিকদের কাছেও সেদিন তখনও ছায়াচিত্র সাংবাদিকতা ছিল প্রায় নিরাকার গোছের; আর আজ চিত্র জগতের মানুষের ঘরের ঘোঁট যখন একেবারে রঙে বেরঙে রসালো হয়ে বাংলা পত্র-পত্রিকার তহবিল চমৎকার ভরা ভর্তি করে তুলেছে তখন বাংলা ছায়াছবিকে বাঁচাতে ডাক পড়েছে—না, কোনো বি. এন. সরকারের নয়, সদাশয় খোদ সরকার বাহাদুরের। (এর পরে সম্ভবত ঈশ্বরকে ডাকা হবে।) পত্রিকার উজ্জ্বলতম ছবিও বাঁচাতে পারছে না আজ বাংলা ছায়াছবিকে; ওর লজিকটা অন্য।

এই যে দৃষ্টান্ত দুটি উপরে দিলাম, দুটিই প্রকৃত প্রস্তাবে বাহুল্য। আসল কথা এটা নয়। তবে দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রথমেই এ সব উল্লেখ করা হলো কেন? কেননা, এতেই আশা করি সবচেয়ে সহজে ধরা যাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কোনো একভাবে ব্যবসায়িক স্বাধীনতার সঙ্গেই কেমন সমার্থক হয়ে আছে। **সংবাদও একপ্রকার পণ্য**। সংবাদ পড়ুয়াদের এ কথাটা বুঝে নেওয়া ভালো। এর ফলে

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মূল্য বা মর্যাদা কি কমে যায়? না, তা যায় না। গণতন্ত্র সম্মত ব্যবস্থায় যে কোনো ব্যবসায়েরই নিশ্চয় একটা স্বাধীনতার প্রয়োজন থাকে; সে ব্যবসায় সংবাদের হোক বা অন্য যে-কোনো পণ্যেরই হোক। কিন্তু এই কথাটা, সংবাদও যে এক বিশেষ ধরনের পণ্য এটা মনে রাখলে সংবাদপত্র-পাঠক হিসেবে আমাদের খেয়াল করতে সুবিধে হয় যে সাংবাদিকের কাছে কী দরের জিনিস আমাদের প্রাপ্য, কিংবা, কেন আমরা সাংবাদিককে বিশেষ রকম স্বাধীনতার অধিকার দিতে চাই (যদি চাই)।

যদি মনে রাখি, সংবাদপত্রের কাজ সংবাদ সরবরাহ করা, সৃষ্টি করা নয়, তাহলে সাংবাদিক (অন্যান্য সমস্ত পণ্য সরবরাহকারীর মতোই) টাটকা আর খাঁটি কিছু খবর আমাদের যোগান দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা রক্ষা করতে পারছেন কি না এটা দেখার দায়িত্ব সংবাদ-গ্রাহক হিসেবে আমাদের অর্শায়। তাহলে পাঠশালায় যেমন করে ঘাড় গুঁজে গুরুমশায়ের কাছে যা শুনে যাচ্ছি তাই বেদবাক্য তেমনি করে কাগজখানি হাতে নিয়েই "দেখেছ, দেখেছ, কী লিখেছে? বাবা কী হয়ে যাচ্ছে!!" বলার পরিবর্তে বরং আমরা পটল কেনার সময়ে যেমন দেখে নিই যে অমন চকচকে সবুজ রং কি তাজা বলে না রং লাগিয়েছে, তেমনি দেখে নেবো সংবাদ; বলবো, "এটা কি ঠিক খবর? এভাবে কথাটা লেখার মানে কী?"

সম্প্রতি, উনিশশো পঁচাশিতে আমি দুটো খবর এরকম নজর করে পড়েছি। প্রাসঙ্গিক সেই অভিজ্ঞতা। দুটিই সভার খবর। মেয়েদের সভা। দুটিরই উদ্যোক্তা দুই ভিন্ন ভিন্ন মহিলা সংগঠন। একটি সভা বসেছিল ফেব্রুয়ারি মাসে, অন্যটি এপ্রিল মাসে। এই সময়ের ভিতরে, আগে এবং পরেও, সাংবাদিকতা শিক্ষার নানা বিধিব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, শিক্ষণ পর্ব চলছে। খুব প্রয়োজনীয় সে সব ব্যবস্থা। আমি আশা করেছিলাম, অন্তত এ সব যখন রীতিমত চালু হয়েছে তখন সংবাদ সরবরাহ যেমন সুন্দর তথ্যনিষ্ঠ অথচ মনোগ্রাহী হতে পারে এর একটা সুন্দর উদাহরণ এখন পাওয়া যাবে,—যদি অবশ্য মাথালো কোনো কাগজে এ সংবাদ বেরোয়। কেননা, কে না জানে, সংবাদ কোন্‌টা বেরোয় আর কোন্‌টা বেরোবে না এ সংবাদ কেউই ঠিক জানেন না। অন্য দেশের কথা বলতে পারি না আমি আদার ব্যাপারী, কিন্তু আমাদের দেশে অন্তত বাংলাভাষী মুলুকে বারোমাসই এ বাবদে যুদ্ধকালীন অবস্থা, অর্থাৎ কোথাও না কোথাও ব্ল্যাক আউট চলছেই খবরের জগতে, অতঃপর খবরের নিঃসন্দিগ্ধ উন্মুক্ত বিবরণ অসম্ভব।

যাই হোক, এই ঘোমটা পরা জগতেও মহিলাদের সভা দুটির খবর একে একে ছাড়া পেলো। কিন্তু যা ছাড়া পেলো, তাকে কি সভার খবর বলে ?

প্রথম সভাটির বিবরণে ছিলো উদ্যোক্তাদের ভুল নাম—যে বাড়িতে ওই সভা চলছিল তার দায়ভার যাঁদের তাঁরাই চিহ্নিত ছিলেন উদ্যোক্তা নামে। সেদিনের সাংবাদিক আমন্ত্রণ পত্রটি ঠিক পড়েই দেখেন নি ? পড়ে ভুলে গিয়েছিলেন কারা উদ্যোগী হয়ে তাঁকে সভায় সংবাদ নিতে ডাকছেন ? না কি, কে জানে হয়ত "যার ক্ষেত্র তার পুত্র" ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিলেন যে বাড়িতে ঘটছে ঘটনা, উদ্যোগ তাঁদেরই—এটাই বলা দরকার ! তাই হবে। কিন্তু, মূল বক্তাদের বক্তব্য, এমন কি নামের সম্পূর্ণ উল্লেখও যে কেন সংবাদের কোথাও নেই, আছে শুধু প্রধান অতিথি কী বলেছেন কয়েক সূত্র জুড়ে সেটা ধরবার চেষ্টা,—এর কোনো কারুনিক সদুত্তর পাওয়াও মুশকিল। এপ্রিলের সভাটি ছিল আলঙ্কারিতা-হীন, প্রধান অতিথি ছিলেনই না কেউ। সংবাদে দেখা গেল এবারে উদ্যোক্তার নামে গোল বাধেনি। কিন্তু আলোচকদের নামের সম্পূর্ণ তালিকা, পূর্ববৎ, অনুপস্থিত। ক'জন মোট বলেছিলেন তা-ও এ খবর থেকে বোঝার উপায় নেই। শুধু তিনজনের ভাষণকে ঠিকঠাক সারসংক্ষেপ বিকৃত করা হয়েছে।

আমি ফেব্রুয়ারি আর এপ্রিলের এই দুই সভাতেই উপস্থিত ছিলাম। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন না, হতে পারেন নি, সেই সব পাঠক এই বিবৃতি দুটি থেকে কী জানতে পারবেন ? এই দুই সভায় ঠিক কারা অংশ নিয়েছিলেন তা তো জানতে পারবেনই না, কতজন অংশ নিয়েছিলেন সেই সংখ্যার হিসেবটুকুও তাঁদের কাছে পৌছবে না। শ্রোতার সংখ্যা কোন্ সভায় কতজন, যাকে "জনসভা" বলে এ দুটি কি সেইরকম না কি বিশেষ বয়সের বিশেষ শ্রেণীর মানুষই ছিলেন এইসব উৎসাহ উদ্রেককারী কোনো তথ্য আন্দাজ করবেন তাঁরা, তার কোনো সম্ভাবনা রাখেনি এই সংবাদ।

অথচ এই-ই যে অবধারিত নয় তা বুঝবার জন্য খেলার পাতা ওল্টানোই যথেষ্ট। খেলার বিবরণ, হোক সে খেলা ফুটবল কি হকি কি ক্রিকেট হলেই প্রতিটি ছোট বড় খেলোয়াড় মিলিয়ে সমস্ত টীমেরই নাম দিতে হতো ('এরিয়ানস্'কে 'ইস্টবেঙ্গল' বলে কাজ চালিয়ে পার পেতেন না কোনো সাংবাদিক) নিশ্চয়ই ? আমি ক্রিকেট খেলা দেখতে যাইনি কোনোদিন। সংবাদপত্র থেকেই ঠিকঠাক জেনে গেছি : যে-কোনো দেশের ক্রিকেট দলে ঠিক কে কে খেলতে এলেন, আমাদের দেশের ক্রিকেট দলের কোন্ কোন্ খেলোয়াড় খেলতে

গেলেন, কোথায়। ইদানীং যেমন, অল্পবিস্তর বরাবরই তেমনি ভাবে কাগজে ছবি ছাপানোর সময়ে কপিল দেব, সানি গাভাসকর এবং রবি শাস্ত্রীদের প্রতি ব্যাখ্যাযোগ্য পক্ষপাত দেখালেও যিনি কোনো রান্ই তুলতে পারলেন না সেই তুচ্ছতম সদস্যের নামও দলের ভিতরে ঠিকই পেয়ে গেছি এবং এখনো পেয়ে যাই। এ সবটুকু, সবকিছুই পাওয়ার কথাই আর পাবো বলেই খেলার খবরের পাতা খুলি। ক্রীড়া সাংবাদিক এই কথা লিখে তাঁর কাজ সেরে দিতে পারেন না যে কপিল কী খেলা দেখালো, আহা ! তাঁকে সকলেই হিসেবের ভিতর ধরে নিয়ে লিখতে হয়, নইলে—কে না জানে—ওটা খেলার বিবরণ হবে না।

এইখানে কি কেউ হাসছেন ?

ভাবছেন, খেলার বিবরণ বিষয়ে মানুষের যা আগ্রহ তার সঙ্গে মেয়েলি সভার কি তুলনা হতে পারে ? হাসুন, কিন্তু হেসে নিয়ে তার পরে একটু লক্ষ্য করুন যে ব্যাপারটা অত হালকা ঠিক নয় ; আর তুলনার কথাটাও মুখ্য নয়। নজর করুন ছায়াছবি নিয়েও খেলার মতোই আগ্রহ মানুষজনের, তাই না ? ছবিঘরের পরে ছবিঘরে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়, প্রত্যহ টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি, তাই তো ? অথচ সেই ছায়াজগতের সংবাদ বলতে যা পাওয়া যায় তার সঙ্গে খেলার বিবরণের তফাত কি লক্ষ্য করেছেন ? কোনো একটা ছবির কাজে (একটা খেলার মতো) যৌথভাবে কারা রয়েছেন তা জানতে পারা তো দূরস্থান, ছবির পর্দায় যারা আছেন তাঁদের সকলের উল্লেখও এখনকার দিনের কাগজে পাওয়া যায় না। এককালে কিন্তু বাংলা ছবিতে শ্রেষ্ঠাংশে এবং অন্যান্য ভূমিকায় বলে একটা উল্লেখ থাকত ; এখন শুধু তারকার নাম এবং স্বয়ং পরিচালক যদি বিদেশী ও দেশী পুরস্কার আহরণের দক্ষতায় 'তারকা' হয়ে উঠে থাকেন তাহলে তাঁরও নাম মিলবে সংবাদের পাতায়। সংবাদপত্রে এইভাবে গড়ে ওঠে সংবাদের সাহায্যে 'স্টার'দের, শুধু 'স্টার' ভাঙা গড়া খেলার, প্রাধান্য। কিন্তু এখানেই শেষ নয় খেলা। পরে 'স্টার সিস্টেম' তৈরি করার জন্য 'ব্যবসায়ী'দের উচ্চকণ্ঠে কটুবাক্য শোনাতে হলে সেই কাজও ঘুরে ঘুরে সাক্ষাৎকারের সাহায্যে প্রস্তুত করবে সংবাদপত্র-ই যেন এই "ব্যবসায়ী"দের অন্যতম ব্যবসায়ী স্বয়ং সংবাদপত্র নয়। যেন 'স্টার-সিস্টেম' ছায়াছবির সংবাদ-ব্যবসায়ীর নিজহাতে গড়া যাদুঘর নয়।

কেন লক্ষ করতে বলছিলাম এটা ? কেন না খেলার খবর নিয়েও এই 'স্টার' তৈরির খেলাটা চলছে। আমাদের দেশে যেখানে খেলার মান একবার উঠলেই দেখতে না দেখতে সেই গল্পকথার ভূতের তেল মাখানো লাঠি বেয়ে নামার মতো

সড়সড় করে নেমে যায় সেখানে খেলাকে একটা যৌথ অভিজ্ঞতার মঞ্চ হিসেবে না সাজিয়ে রঙচঙে শব্দজালের যাদু গড়ে খেলার জগতের মহাপুরুষদের চিহ্নিত করে পুরোপুরি তারাবাজি ওড়ানোর একটা চেষ্টা এমনই দ্রুত এগোচ্ছে যে, খেলার জগতের গল্পস্বল্প নিয়ে পত্রপত্রিকা এর ভিতরেই একটি ছুটি করে বেশ ফেঁপে উঠতে শুরু করেছে। পরে আরো হবে। একই খেলা এবং খেলোয়াড় যেহেতু জনচক্ষুর সামনে প্রত্যহ আসতেই পারে না কিন্তু কাগজ পারে, তাই কাগজের খেলাটা হচ্ছে প্রথমে লক্ষ করা কে উঠছে কে নামছে এবং তারপরে সুবিধে মতো এদের কাউকে নিজের ঘোড়া করে নিয়ে প্রত্যহ লোকের চোখের সামনে বিবিধ চেনাজানা-প্রীতিকর পরিবেশের ফ্রেমে এনে এনে উপস্থিত করে দেওয়া। 'মিডীয়া'র সাহায্যে এই উপস্থিতি অতঃপর হয়ে উঠবে খেলোয়াড়টির "পাবলিক ইমেজ", বানাবেন সাংবাদিকরা। সাংবাদিকদের হাতে না রাখতে পারলেই এই "পাবলিক ইমেজ" তথা খেলোয়াড়ের বারোটা বেজে গেল। এই খেলা এখনো পুরোদমে জমে ওঠেনি। যেমন একেবারেই ঠিকঠাক জমেনি সাহিত্যিক তথা বিদ্বজ্জনদের 'তারকা' গড়ে তোলার কাজ। এই শেষের ক্ষেত্রে খবরকেই বিজ্ঞাপন করে তোলা চলছে আস্তে আস্তে, এটাই প্রথম ধাপ এ কাজের, রীতিমত জরুরি ধাপ।

সবাই জানে, জনসাধারণ বাজারে গিয়ে শুধু পটল আলু কেনেন না, গঞ্জিকা, অহিফেন ইত্যাদিও কেনেন। বাজারে সওদাও নানাপ্রকার সেইভাবেই যোগান আসে। সংবাদপত্র তেমনি শুধুমাত্র সংবাদকে পণ্য না করে নেশাকেও পণ্য করে থাকে; করতেই পারে। কিন্তু সংবাদগ্রাহকদের কাজ হবে সেই ঝোঁকটার দিকে নজর রাখা যে, ঝোঁকে কেমন যেন ভোজ্যপণ্য এবং আবগারি মাল একইভাবে 'সংবাদসেবা'র ছত্রছায়ার তলে না এসে যায়। জেনেশুনে গ্রাহকদের যে কেউ চাইলে নেশার গপ্পো-সপ্পো কি বিজ্ঞাপনের চাট নেবেন, তাঁদের নিশ্চয় সে স্বাধীনতা আছে; তেমনি সংবাদগ্রাহকদের স্বাধীনতা থাকা দরকার সংবাদকে পুরোপুরি সংবাদ হিসেবেই পাওয়ার। এটুকু যিনি দিতে জানবেন, পারবেন তিনি একজন সৎ সাংবাদিক! তাঁর খবর সংগ্রহের এবং প্রকাশের অখণ্ড স্বাধীনতা আপনি, আমি সকলেই চাই, সাংবাদিকও চান। স্বাধীনতা না থাকলে তিনি এই বিশুদ্ধ সঠিক সংবাদ দিয়ে উঠতে পারবেন কি! না। 'গৃহযুদ্ধ' ছবিতে সাংবাদিক-ভূমিকায়-নিহত গৌতম ঘোষকে দিয়ে পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত এই কথারই যাথার্থ ফুটিয়েছেন। একেবারে মরে না গেলেও কণ্ঠরুদ্ধ বহু সাংবাদিক এখনও এদেশেই আছেন এটা আমরা বিশ্বাস করি বলেই

সাংবাদিকের স্বাধীনতা কথাটাকে মূল্যহীন মনে হয় না। চাই যে এ মূল্য থাকুক।

কিন্তু সেই মূল্যটুকু বাঁচানোর জন্যে এখনকার মুখ্য সাংবাদিকদের নিয়ত চেষ্টা থাকলে কি সামাজিক ঘটনাবলীর ওরকম বিচিত্র, খণ্ডিত বিবরণী উনিশশো পঁচাশিতেও বেরোতো? বিশেষ করে যখন নাকি মেয়েদের অবস্থা, ওর-নাম-কি পণপ্রথা, বধূহত্যা এইসব শিরোনাম প্রস্তুতকারী সংবাদ সংবাদপত্রগুলির বেশ চলতি পণ্য তখনও কলকাতার দু-দুটি বড়ো সভায় মেয়েদের নিয়ে কে কে বললেন, কতজন শুনতে এলেন এ খবরও যে কোনো যথার্থ বিবরণ পেলো না, দুটি-তিনটি নামকে তারকা অক্ষরে সাজিয়ে দেবার সুযোগ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে গেল এই সামাজিক জমায়েত, এতে সংবাদপত্রের মূল্যমান নিয়ে, সাংবাদিকদের নিয়ে ভাবনা ধরে। সাংবাদিকরা গ্রাহকদের সম্পূর্ণ সংবাদ পাওয়ার স্বাধীনতা খর্ব করে দিয়ে নিজেদের স্বাধীনতাকে পবিত্র বলবেন? পবিত্রতা একটু বড় কথা যে। যাঁরা আমাদের দেশে উপনিবেশ করতে এসেছিলেন, যাঁদের 'মিডীয়া'কে প্রতি পদক্ষেপে অনুসরণ করে করেই আমাদের এই যুদ্ধকালীন সংবাদ-সরবরাহী মনোভাব রয়ে যাচ্ছে, তাঁদের কাছে 'পবিত্রতা' ও অবশ্য চটকদার বিজ্ঞাপনের ভাষা হয়ে গেছে। আমাদের বাংলায় তা না-ই বা হলো।

গল্প

কর্ণেল রাজার কবর

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

—হ্যালো কে. জে., ওল্ড্ বয়, হাউ আর উই? ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ভুরুতে জট। সামথিং ট্রাবলিং ইউ?

—ওঃ, ইটস্ ইউ, রাজা মাই অল্ড চাম্, টেকন্ দা ট্রাবল অভ্ কামিং অল দা ওয়ে ফ্রম ভালহাল্লা টু লুক আপ ফর ইওর কিলার!

—অল গস্, তুমি আমাকে মারতে যাবে কেন? ইউ ওয়্যার যাস্ট আ স্মল পন্ অন্ দা ভাস্ট চেকার্ড বোর্ড। সো ওয়াজ আই। মরবার জন্যেই তো বোড়েদের জন্ম। তুমি আমাকে না মারলে আমিই তোমাকে মারতাম। বোথ অভ আস ওয়্যার আণ্ডার অর্ডারস টু কিল ইচ আদার। তুমি তো একটা ডেকোরেশান পেয়েছিলে, তাই না?

—ফর কিলিং মাই স্কুল চাম, ইয়েস। আই গট আ ভি. আর. সি., আ ভীর চক্র।

—এ্যাণ্ড আই গট নাথিং। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ নেই। নো রিগ্রেটস্।

সুকান্ত এতক্ষণ একটি একক নাটকের শ্রোতা? অভিনেতা একজনই। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল কানওয়ার জয় সিং। কোর হেডকোয়ার্টারে জি-ওয়ান (আই) অর্থাৎ জেনরেল স্টাফ অফিসার নাম্বার ওয়ান (ইনটেলিজেনস্)। একাই বলে যাচ্ছেন দুটো আলাদা আলাদা সংলাপ। হাতে হুইস্কির গ্লাস। কিন্তু কথাবার্তা, মুখের হাবভাব পুরোপুরি আদবকায়দার চৌহদ্দির মধ্যে। গেলাস বেশ বার কতক খালি-ভর্তি হলেও তার কোনো ইতরবিশেষ নেই।

সুকান্ত এই নিয়ে তিন বার এল কর্ণেলের ঘরে। জায়গাটা আধা-ফরোয়ার্ড এরিয়া। ফ্যামিলি স্টেশান নয়। প্রত্যেক অফিসারের জন্যে কিউবিকলের চেয়ে একটু বড় একখানা করে ঘর বরাদ্দ। পর্দার ঘেরাটোপের আড়ালে জামা-কাপড় ছাড়ার ব্যবস্থা। সঙ্গে এ্যাটাচড্ বাথ।

দ্বিতীয় দিনেই কর্ণেল বলেছিলেন, কল মি কে. জে.। তারপর নিজেকে একটু খোলসা করেছিলেন: আমি নাকি জন্মেছিলাম এক রক্তি চেহারা নিয়ে। মাই ওল্ড ম্যান, আ বার্লি সিক্স-ফুটার, কলড্ মি মিকি মাউস। সেই থেকে বাড়িতে আমি মিকি। দেন আই সাডেন্‌লি স্টার্টেড্ গ্রোয়িং আপ ইন মাই টিনস্। ষোল বছর বয়েসে সোজাসুজি তাকালে বাবা আমার চোখের বদলে গোঁফ দেখতেন। ডাকতেন কিন্তু সেই মিকি বলে। তার অনেক আগেই রাজা আমার নামটা ছেঁটেছুঁটে কে. জে এই ইনিশিয়ালের ক্যাপস্থলে পুরে দিয়েছে।

—কোন্ রাজা? সেই কর্ণেল রাজা, সি. ও, থার্টি সেকেণ্ড বালুচ? হ্যাঁ-মার্কা জবাব পাবে জেনেও জিজ্ঞাসা করেছিল সুকান্ত।

—দা সেম ডিয়ার ওল্ড চ্যাপ। সেই থেকে ঘরে আমি মিকি, বন্ধু-বান্ধবের কাছে কে জে। কথাগুলোর আগে একটা ছাঁটাই-করা দীর্ঘনিঃশ্বাস। চেনা ছবির বদলে চৌকো সাদা দেওয়াল দেখলে মনের মধ্যে শব্দহীন দাপাদাপি। সেই ঝড়ের পিঠে সওয়ার হয়ে পুরোন কথারা হু হু করে খড়কুটোর ঘূর্ণি। কে. জে-র কথাগুলোর ওপর বাড়তি ওজন নেই। আছে অনেক দূরের বৃষ্টির ঘ্রাণ।

কে. জে-র সঙ্গে সুকান্তর পরিচয়ের হাইফেন কোর হেড কোয়ার্টারের পাব্লিক রিলেশানস্ অফিসার, মেজর দুবে। চাকরির প্রয়োজনে সুকান্ত একটি বেবি হার্মিস পোর্টেবল টাইপরাইটারের মালিক। আঙুলের ঠোকায় যন্ত্রটি গত পনেরো বছরে কয়েক লক্ষ ইংরিজি শব্দ উগরে দিয়েছে। এর অর্ধেকেরও কম ছাপা হয়েছে ছোট বড় নানান খবরের চেহারায়। বাদ বাকি খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে "কিলড্" অর্থাৎ নিহত। আর বাঁচলেই বা কী। আয়ু তো শ্যামা পোকার। এক দিনের আয়ু ফুরোলে সব কাগজই অন্তিম পর্বে ঠোঙা। সুকান্তর এক এক সময় মনে হয় খবরের কাগজের এ্যানসিলিয়ারি ইনডাসট্রি হ'ল ঠোঙা শিল্প। কাগজের মালিকরা নিজেরাই জানে না কত হাজার পরিবার করে খাচ্ছে তাদের দয়ায়।

যে শহরটা সুকান্তর কাজের খুঁটি, তার রাস্তায় হরবখত শক্তিমান ট্রাক আর জোব্বা গাড়ি। দোকানে বাজারে সবুজ উর্দির লোক দেখলে কেউ অবাক হয় না। কাছেই কোর হেড কোয়ার্টার। পরের পর আর্মি পি. আর. ও.-দের সঙ্গে

সুকান্তর বাঁধা খাতির। কোর হেড কোয়ার্টারে আলফা মেস, ব্রাভো মেস দুটোতেই মাঝেমাঝে খানাপিনার নেমন্তন্ন পায়। কে. জে.-র সঙ্গে আলাপের প্রথম টপিক নকশালদের কটা দল আর তাদের নখদাঁতের জোর কোথায় কেমন। কেমন করে এসে গেল কর্ণেল রাজার কথা।

—বাট ইউ কুডন্‌ট হাভ নোন হিম, কে. জে-র গোঁফের মতো স্বাস্থ্যবান ভুরু লাফিয়ে উঠল।

—আই নেভার সেড্‌ আই নিউ হিম, সুকান্ত কে.-জে.-র বিস্ময়ের খই না পেয়ে বলল, কর্ণেল রাজা না মারা গেলে তাঁর নাম জানার আমার কোনো সুযোগই হ'ত না। বাট হি বিকেম এ লিভিং এমবডিমেণ্ট অভ গ্যালাণ্ট্রি ইন হিজ ডেথ। আমাদের অফিসাররাও বলেছেন সি. ও. থার্টি সেকেণ্ড বালুচের দুর্দান্ত সাহস, আর বীরত্বের কথা। আই ওয়াজ টোলড্‌ হি লিটেরালি ফট টু দা লাস্ট ম্যান এ্যাণ্ড দা লাস্ট বুলেট। অ্যাণ্ড হি ফেল ইন আ হ্যাণ্ড টু হ্যাণ্ড কমব্যাট।

—নো ওয়ান নোজ ইট বেটার দ্যান মি, কে. জে-র চোখ সুকান্তকে দেখেও দেখছে না, চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে গেছে বহু দূরে, কথাগুলো বরফ জলে ডোবান। কে. জে. বললেন, বলতে গেলে আমিই মেরেছিলাম কর্ণেল রাজাকে। ফিকস্‌ বেয়নেট্‌স্‌ অর্ডার দিয়ে যে সেকটার দিয়ে ব্রেক আউট করার চেষ্টা করেছিল সেখানে পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল থ্রি বাই টু গোর্খাজ, একটু থেমে প্রত্যেকটা কথাকে আলাদা আলাদা করে গড়িয়ে দিলেন, এ্যাণ্ড আই লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল কে. জি. সিং ওয়াজ দা সি. ও. অভ্‌ দ্যাট ব্যাটালিয়ন অভ্‌ গোর্খাজ।

সুকান্তর সারা মনে ছমছমে বিস্ময়। পাশাপাশি বসে ছিল আর্মি মেসে বার রুমের সোফায়। এবারে একটু কাত হ'য়ে বসল। সামনে একজন জলজ্যান্ত ওয়ার হিরো। একজন জওয়ান সামনের নিচু টেবিলে দুটো হুইস্কির গ্লাস আর স্ন্যাকসের ডিস রেখে গেছে। সুকান্ত উত্তেজনায় তিনটে খুদে খুদে ককটেল সসেজ খেয়ে ফেলল।

কে. জে.-র রোদ-জল-ঝড়ে পেতে দেওয়া পেটান মুখে এতক্ষণ বয়েস আর অভিজ্ঞতার নাছোড়বান্দা ভাঁজগুলো ছাড়া কোনো বাড়তি রেখা নেই। চোখের সামনে ঘরের দেওয়াল, চাপা আলো, অন্য অফিসারদের এধার-ওধার যাতায়াত দেখেও না দেখার মতো ভেতরের মানুষটা হয়তো সি. ও থ্রি বাই টু গোর্খাজ আর সি. ও. থার্টি সেকেণ্ড বালুচের শেষ লড়াইয়ের দু বছরের পুরোন ছবিটার ওপর দাগ বুলোচ্ছে। সুকান্ত অগত্যা হুইস্কির গেলাসে পয়লা চুমুকটা দিল একা একাই।

চিয়ার্স বলতেও ভরসা পেল না।

আচমকা মুখ না খুলে শুধু গলার মধ্যে একটা হাসিকে ছোট ছোট তিন-চারটে ধাক্কায় খেলালেন কে. জে.। হাসিটার জাত-বিচার করতে গেলে মকারি, সেলফ-পিটি এই সব ইংরিজি কথাগুলো মনে হয়। কে. জে.-র মতো পোড়-খাওয়া প্রফেশানাল সোলজারের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

—দ্যাট জোকার অ্যাসপায়ার্ড টু বি এ্যান আর্টিস্ট, হাসিটার মানে কথা হ'য়ে বেরিয়ে এল।

—হু, তাজ্জব হ'য়ে বলল সুকান্ত।

—কে আবার, লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল সুলতান আহমেদ রাজা, দা লেট কম্যাণ্ডিং অফিসার অফ দা থার্টি সেকেণ্ড বালুচ।

—চেনা লোক?

—উই ওয়্যার স্কুল চামস্‌ এ্যাট লাথনো; একটু থেমে বললেন কে. জে., পার্টিশান ডিড্‌ স্ট্রেঞ্জ থিংস টু ওয়ান-টাইম ফ্রেণ্ডস এ্যাণ্ড, মাঝখানে একটা চেপে দেওয়া নিঃশ্বাস, সো ডিড্‌ দা ওয়ার।

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা প্রায় ভূগোলের ক্লাস। দেওয়ালে ঢাউস ম্যাপ। তার এখানে ওখানে লাল সবুজ ছোট ছোট ফ্ল্যাগ-লাগান পিন গাঁথা। আছে লম্বা ম্যাপ পয়েণ্টার। তার মোটা দিকটা বাঘের খাবা মার্কা মুঠোর মধ্যে। কনুয়ের ওপর পর্যন্ত গোটান ইউনিফর্মের বাইরে হাতটার স্বাস্থ্য হাতের মালিকের সঙ্গে মানানসই। লম্বায় মানুষটি ছ' ফুটের দু-এক ইঞ্চি ওপরেই। এক মাথা ঠাসা চুলের মধ্যে মাঝে সাদার পোঁচ ভয়ে ভয়ে বুলিয়ে বয়েস থমকে থেমে। খোলা আকাশের তলায় অনেক বছরের রোদে জলে মুখের চামড়া তামাটে। শরীরের কাঠামোয় হাড়ের বদলে ইস্পাতের রড্‌।

ইনিই এই ক্লাশের মাস্টারমশাই। কাঁধের এপলেটে খুদে অশোক স্তম্ভের পাশে আড়াআড়ি তরোয়াল আর ব্যাটন বলে দিচ্ছে এঁর পরিচয়। অলিভ গ্রীন উর্দি-পরা লাড়িয়েদের একজন লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল। তিনটে ডিভিশান নিয়ে একটা আর্মি কোর। জেনারেল হ'লেন কোর কম্যাণ্ডার; বেশ কয়েক হাজার জঙ্গী মানুষ দিয়ে বানান পিরামিডের চুড়ো।

বছর দুই আগের ডিসেম্বর মাস। তখনো যে জায়গাটাকে পূর্ব পাকিস্তান বলত, তার ম্যাপের চেহারা বদলে যাচ্ছে রোজ। নাবাল জমির কানা বেয়ে বেনো

জলের ঢল হ'য়ে ঢুকছে যারা তাদের গায়ে অলিভ গ্রীন উর্দি। সেই তোড়ের দিকে পিঠ করে হুদ্দাড় করে পালাচ্ছে খাকি ইউনিফর্ম পরা পশ্চিম পাঞ্জাব, পাঠান মুলুক আর বেলুচিস্থানের বিরাট চেহারার লোকগুলো। কামানের গোলায় দেওয়ালের গায়ে হাঁ-করা অন্ধকার। যেখানে সেখানে এক মানুষ সমান পুড়ে ঝাঝা রাক্ষুসে গর্ত। কুঁড়েঘরের চালে লতানে লাউডগার বদলে ফণাতোলা আগুন।

কোর কম্যাণ্ডার বলছিলেন অলিভ গ্রীন উর্দির তরতরিয়ে এগিয়ে যাবার কথা। মাঝে মাঝে ম্যাপের গায়ে পয়েণ্টারের ঠোকর। সুকান্ত আর ক্লার্কের অন্য সব পড়ুয়ারা নিজের নিজের ডেস্কের ওপর ঝুঁকে। সামনে রাখা নোট বই ভরে উঠছে লেখায়। দেশে যারা খবরের কাগজ পড়ে, রেডিও শোনে, অলিভ গ্রীনের ধাক্কায় খাকি উর্দি কতটা পেছলো তা জানান সুকান্তদের কাজ।

যেখানে গনগনে লাল শিসের টুকরো হন্যে হয়ে খুঁজছে শিকার, হঠাৎ ছিটকে পড়া রক্তে মাটির রঙ যাচ্ছে বদলে, সুকান্তরা সেখান থেকে অনেক দূরে। বাইরে টিমে আঁচের নিশ্চিন্ত দুপুর। গাছের পাতা, বাগানের ফেয়ারি করা ফুল আরামে রোদ পোয়াচ্ছে। কান পাতলে পাখির ডাক শোনা যায়।

তবু সুকান্তদের কারুর কারুর মিলিটারি সাজার শখ। আর্মি পাইলের সম্বন্ধী সব। একজনকে দেখলে মনে হয় থিয়েটারে আর্মি সার্ভিস কোরের মেজরের পার্ট করার জন্যে তৈরি। সেই রকমই পোষাকের চেকনাই, কাঁধে র‍্যাংকের ইনসিগনিয়া। কোর কম্যাণ্ডারের গলার আওয়াজে ওঠানামা নেই। বলছিলেন রংপুর জেলার একটা জায়গায় খাকি উর্দির একটা ব্যাটালিয়ান আটকা পড়েছিল জাঁতিকলে। পালাবার সব রাস্তায় অলিভ গ্রীনরা থানা গেড়ে বসে। তবু এই খাকি উর্দির দল অস্ত্র ফেলে মাথার ওপর দু হাত তুলে এগিয়ে আসেনি।

—বাট দ্যাট স্মল পকেট অভ রেসিশট্যান্স্, কোর কম্যাণ্ডারের গলায় একদম ঘরোয়া কথা বলার মেজাজ, হ্যাড ফাইনালি বিন এলিমিনেটেড বাই আওয়ার বয়েজ। খাকি উর্দিরা কিন্তু লড়েছিল দারুন। যাকে বলে ফট লাইক হেল। একেবারে শেষ বুলেট, শেষ মানুষ পর্যন্ত। গুলিগোলার শব্দ বন্ধ হ'লে পাওয়া গেল কিছু জখমি মানুষ। তাদের কারুরই উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই।

জমি দখলের এই ভীষণ খেলায় রংপুর জেলার ম্যাপ থেকে বাতিল সেই জায়গাটাই রাতারাতি নামজাদা। ঠাঁই পেয়ে গেল সেদিনের কমিউনিকের মধ্যে! অলিভ গ্রীন আর খাকি উর্দির অনেকেরই জীবনের লাস্ট স্টপ সেখানে।

—জেন্টলমেন, কোর কম্যাণ্ডার তেমনি সাধারণ কথা বলার ঢংয়ে বললেন, ইন

দা ফাইনাল এ্যাকশান, লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল সুলতান আহমেদ রাজা, কম্যাণ্ডিং অফিসার অভ দা থার্টি সেকেণ্ড বালুচ ওয়াজ কিলড্।

বলেই পাশের দিকে তাকালেন কোর কম্যাণ্ডার। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে কোরের চিফ অভ দা স্টাফ, মেজর জেনারেল। লম্বায় কোর কম্যাণ্ডারের কান বরাবর। কিন্তু তাঁর তুলনায় কোর কম্যাণ্ডারের লোহা পেটান চেহারাও বেশ স্লিম, হালকা পাতলা। তা বলে মোটা নন চিফ অভ দা স্টাফ। ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত বড় মেরের সলিড্ গ্রানাইট পাথরের চাঙড় একখানা। হাতুড়ি দিয়ে ঠুকলে যেন ঠক ক'রে শব্দ হবে। কোর কম্যাণ্ডার তাকাতেই বুক সমান উঁচু ডেস্কের ড্রয়ার থেকে কী সব যেন বার করলেন।

—হিয়ার আর দা শোলডার ব্যাজেস্ অভ কর্ণেল রাজা, কোর কম্যাণ্ডারের গলায় এতক্ষণে একটু বাড়তি জোর।

চিফ অভ দা ষ্টাফের সামনে বাড়ান বিশাল দুই হাতে দুটো ইঞ্চি চারেক লম্বা কাপড়ের ফালি। তাতে র‍্যাংকের ইনসিগনিয়া লাগান। এ তরফের অশোক স্তম্ভের বদলে একটা সার্কলের মধ্যে কুমড়ো ফালি চাঁদ আর এক রত্তি তারা। তাছাড়া আলাদা একটা বড় তারা। কালো রঙের আস্তরের তলায় একটু লাল আভা।

অমনি মেঝের ওপর একসঙ্গে অনেকগুলো চেয়ার সরানর শব্দ। সামনে যাবার জন্যে পড়ুয়াদের মধ্যে ঠেলাঠেলি। সুকান্ত বসেছিল পয়লা সারিতে। দেখল আগ্রহের দৌড়ে লাস্ট বয় বনে গেছে। আর সবার হাতে হাতে ঘুরছে কর্ণেল রাজার শোলডার ব্যাজ দুটো। ঘরের বাইরে রোদের আঁচ আরো মরে এসেছে।

সুকান্তর ছোটবেলায় পৃথিবীর নানান দেশের মধ্যে পাঁচ-ছ' বছর ধরে সাংঘাতিক লাঠালাঠি চলেছিল। তখন আফ্রিকার উত্তরদিকের মরুভূমি রোমেলের আফ্রিকা কর্পসের খাসতালুক। ভিন রাজ্যে রাত দুপুরে খোঁচা দিতে যেত ইংরেজদের লং রেঞ্জ ডেজার্ট পেট্রল। ব্রিটিশ অফিসাররা গা বাঁচিয়ে অনেক দূরে পার্ক করা জিপের পাহারায় থাকত। সামনে ঠেলে দিত গোর্খাদের। কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরে আসত গোর্খারা। সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় সাদা মানুষের কান। কাম হাসিল করার প্রমাণ।

—এ্যাণ্ড হিয়ার ইজ দা পে বুক অভ কর্ণেল রাজা, এক ঘর লোকের কথার ভনভনানি ছাপিয়ে আবার শোনা গেল কোর কম্যাণ্ডারের গলা।

চিফ অভ দা স্টাফের হাত আবার উঁচুতে। ছোট্ট পে বুকের পাতা দুটো

চিত্তিয়ে ধরা। বাঁ দিকের পাতায় পাশপোর্ট সাইজের ছবি। একটু লম্বাটে ভরাট মুখ। মনে হয় তো রঙটা ফর্সাই ছিল। চুলের লাইন পিছিয়ে কপালটা একটু বেশি চওড়া। নাকের নিচে ভারি থানিকটা ভোঁতা গোছের গোঁফ, ডগাগুলো পাকান নয়। ছবি তো মানুষকে সব সময়েই একটা বয়েসে আটকে রেখে দেয়। আসল মানুষ বেঁচে থাকে আবার থাকে না। ছবির মানুষই শুধু পারে মৃত্যুর মুখের ওপর তুড়ি মারতে। হাসিটা পর্যন্ত সময়ের ঘষায় এতটুকু ফিকে হয় না। ছবির মানুষটিকে দেখে ভাবতে ইচ্ছে করে না জঙ্গিশাহীর একজন মনসবদার হিসেবে। মুখে একটা আলগা হাসি। চোখের চাউনিতে কোনো মারপ্যাঁচ নেই। গায়ে সাদা ওপন নেক শার্ট। গলায় স্কার্ফ। মিলিটারি অফিসার না হ'য়ে কোনো অফিস একজিকিউটিভও হ'তে পারে। এমন খোলামেলা চেহারার লোকের স্ত্রীর হয়তো খুব বেশি অভিযোগ নেই। ছেলেমেয়েরা ইচ্ছে করলেই হাত ধরে ঝুলে আবদার করতে পারে। অথচ সুকান্তকে ভাবতে শেখান হ'য়েছে লোকটা জাত সাপ। এর মরা মানে আপদের সংখ্যা একটি কম।

ছবির নীচে ডেট অফ বার্থ। তারিখটা দেখে সুকান্ত চমকাল। খুবই চেনা দিন। এমন কী বছরটাও এক। ছোটবেলায় মা পায়েস বানিয়ে খাওয়াতেন এই দিনে। এখন চুল পাকা ইস্তক দিনটার কথা খেয়াল হলে মন খারাপ হবেই। আরো এক বছর বয়েস বাড়ল। একই দিনে, একই বছরে জন্ম আমার আর এই ছবির মানুষটির। তখন পাকিস্তান তো দূরের কথা, বার্মাকে পর্যন্ত ভারতবর্ষের ম্যাপের মধ্যে দেখান হ'ত। সুকান্তর মনে হ'ল লোকটি ছবির মধ্যে ভীষণভাবে জ্যান্ত। আসল মানুষটা কে জানে কোথায় মাটির মধ্যে শুয়ে একটু একটু করে মাটি হ'য়ে যাচ্ছে। কাঁটায় কাঁটায় আমার সমবয়েসী। এই গৃহস্থ লোকটি ক'জোড়া চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে কোনো দিন জানা যাবে না। অথচ সারেণ্ডার করলে বাঁচতে পারত। ওরই মতো খাকি উর্দি অনেকে তা করেওছে। আলিভ গ্রীনরা জেনেভা কনভেনশান মানে। অস্ত্র পায়ের কাছে রাখলে খারাপ ব্যবহার করে না। তবু সে সুযোগ পেয়েও নেয় নি। মরিয়া হ'য়ে বাঁচার জন্যেই কি হয়—এসপার-নয়-ওসপার বলে জীবন নিয়ে শেষ জুয়া খেলতে চেয়েছিল? কে জানে। চক্রব্যূহে সপ্তরথী পরিবৃত অভিমন্যু কি মরবে বলে প্রতিজ্ঞা করে যুদ্ধ করেছিল? নিশ্চয়ই না। সামরিক পরিভাষায় ইমোশানের জায়গা নেই। ফৌজি লবজে ছোট্ট কে. আই. এ.—ফিলড্ ইন এ্যাকশান—কথাটার নিচে সব অভিমন্যুদের শেষ লড়াই চাপা পড়ে যায়।

একাত্তরের লড়াই সুকান্তকে মেলাই প্রেজেণ্ট দিয়েছে। সবগুলোই নানান ধরনের মানুষ মারা কলের অংশবিশেষ। চাইনিজ হ্যাণ্ড গ্রিনেডগুলোর মধ্যে আবার একটু শিল্পের ছোঁওয়া। খুদে খুদে রুপোলি আনারস। ওপরটা খাঁজ কাটা। প্রত্যেকটা চৌখপ্পির ওপরে একটি করে লালের ফোঁটা। ফিউজগুলো খুলে ফেলতেই ওদের নখ দাঁত অকেজো। এখন নির্দোষ খেলনা। ভূমিকা বদলে কাগজ চাপার কাজ করছে। ছোট ছোট লোহ'র বাটি। ছিল দু ইঞ্চি মর্টারের গোলার নরম নাকের ঢাকনি। সুকান্তকে আর এ ঘর থেকে ও ঘরে এ্যাশট্রে নিয়ে যেতে হয় না। মাথায় পেতলের তকমা লাল আর সবুজ খোলে মোড়া ভেরোলাইট পিস্তলের মোটাসোটা কার্ট্রিজ ছিল বেশ কয়েকটা। মানুষকে কিমা বানাবার কাজে এগুলোরই সোজাসুজি কোন মুরোদ নেই। নেহাতই সিগন্যাল ফ্লেয়ার। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে রাতের অন্ধকারের ওপর লাল বা সবুজ ছোপ ফেলার কাজ। মুখের কথার বদলে রঙিন আলোর টরেটক্কা। লড়াইয়ের সময় কখনো জানানি দেয়—কাম ফতে, কখনো আভাস দেয় আসন্ন সর্বনাশের। যারা বোঝবার তারা বোঝে।

এগুলো সুকান্তর ছেলে বাবিনের সম্পত্তি। মানুষ মারার কাজে লাগে না শুনে একটু ক্ষুণ্ণ বাবিন। তার নজর বরং রুপোলির ওপর লাল ফোঁটা দেওয়া চাইনিজ গ্রেনেডগুলোর ওপর। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখেছে। হাতের মুঠোর মতো সাইজ হলে কি হবে ওজনে বেশ ভারি। তবু ছোঁকছোঁকানি যায় না। এই ব্যাপারে সুকান্তর পাকাপাকি তফাৎ যাও হুকুমজারি। চোখ রাঙিয়ে এবং শক্ত গলায়। আর্মি অর্ডন্যান্স্ কোরের সেই ছোকরা ক্যাপটেন—নামটা এখনো মনে আছে, ডিক্রুজ—বলেছিল, এগুলো এখন এ্যাবসোলিউটলি হার্মলেস। ফিউজ খুলে নিয়ে মাটির ওপর বার বার আছাড় মেরেছিল। একটাই শুধু সাবধানবাণী: ভেতরের একস্প্লোসিভটা অবশ্য ঠিকই আছে। কিন্তু জলন্ত উনুনের মধ্যে না রাখলেই হলো। এমনি ড্রয়িং রুমে সাজিয়ে রাখলে বাঁকুড়ার পোড়া মাটির ঘোড়ার মতো নিষ্পাপ। কে বলবে ওদের মধ্যে মৃত্যুবীজ ঘুমিয়ে আছে।

সুকান্তর স্ত্রী রিনির গ্রেনেডগুলো দেখলে গা শিরশির করে। বাবিনের লাল-সবুজ কার্ট্রিজ নিয়ে খেলাটাও তার না-পসন্দ। কিন্তু পি-টি সেভেন্টি সিকস্ ট্যাংকের সেভেন্টি এইট মিলিমিটারের পেতলের খালি শেল দুটোর ওপর তারও অপার মমতা। ব্র্যাসোর গুণে আর রিনির হাতের মেহনতে শেল দুটো সব সময়ে সোনালি জেল্লা ঠিকরোচ্ছে। এগুলোর জন্ম রুশ দেশে। ওপরে রাশিয়ান হরফে

কি সব লেখা ছিল। নিয়মিত ঘষামাজায় হরফগুলো মুছে গেছে। এখন শেল ছুটোর কাজ জোড়া ফুলদানির হয়ে প্রক্সি দেওয়া। চীনে তৈরি হানড্রেড্ সিক্স্ মিলিমিটার রিকয়েললেস গানের জালিকাটা লোহার কেসটাও রিনির খুব পছন্দ। ভেতরে লাগান আলোটা জ্বাললে কি সুন্দর সাদাকালোর নকসা।

সুকান্ত এক এক সময় ভেবেছে দুই ভিন্ন দেশে তৈরি তিনটে শেলই লড়াইয়ের সময় প্রচণ্ড শব্দে আগুন, স্পিনটার আর মাটির ফোয়ারা তুলে আছড়ে পড়েছে। সেই ক' সেকেণ্ডের তুলকালাম কাণ্ডের মধ্যে কোনো মানুষের কি পিণ্ডি পাকিয়ে গিয়েছিল? অথচ এগুলো তো আতসবাজী নয়। প্রথম ছুটো অলিভ গ্রীনরা ছুঁড়েছিল খাকি উর্দিদের তাক করে। অন্যটা ঢিলের জবাবে পাটকেল। নিজের নিজের কাজ সেরে এখন খালি শেলগুলো শূন্যগর্ভ তুবড়ির খোলের মতো অর্থহীন।

লোডশেডিংয়ের মধ্যে মোমবাতি জেলে বসেছিল রিনি। বাবুন কখন ঘুমিয়ে কাদা। চারিদিক সুনসান। ঘড়ির কাঁটা টিপি টিপি পায়ে সাড়ে বারোটার দিকে। জমাট নিস্তব্ধতার ওপর পর পর তিনটে গদিমোড়া হাতুড়ির ঠোক্কর। বোমা ফাটার শব্দ। সন্ধের পর এ-শহরে মধ্যেমাঝেই শোনা যায়। শব্দের উৎস কাছাকাছি নয়। বেশ দূরে। তবু একটু শিউরে উঠল রিনি। সুকান্তর ডিনারের নেমন্তন্ন কোর হেড কোয়ার্টারে। অফিস থেকে চিফ অভ দা ব্যুরো ডুবার টেলিফোন করেছিলেন। শেষ বার সাড়ে দশটার সময়। খুব দরকার নাকি সুকান্তকে। অথচ ব্যাপারটা কী খুলে বলেননি। এখনো ফেরেনি, কথাটার মধ্যে বিরক্তির ঝাঁঝটা স্পষ্ট। রিনির ঠোঁট ছুটো শক্ত হয়ে চেপে বসল। কোর হেড কোয়ার্টারের নেমন্তন্নে সুকান্ত যায় এক রকম, ফেরে আরেক রকম হয়ে। যে লোক এমনিতে কথা বলে সোনা ওজন করার নিক্তিতে মেপে, সেই মানুষই আবার রাত ছুপুরে কথায় ছয়লাপ। কী পাই নি তার মিলাতে মন মোর নহে রাজি গানটা উল্টে গায় মন মোর উৎসাহী আজি। এবং তার পরেই শোকোচ্ছ্বাস। এই থার্ড রেট ফোর্থ রেট লোকজনের হুকুম তামিল করার বাধ্যবাধকতায় গভীর আত্মগ্লানি। এক অকালমৃত প্রেমিকার নাম ধরে ডাকাডাকি। তবে কথার এই কলকল্লোল বিছুবিড়োনির চেয়ে ওপরে বড় একটা ওঠে না। তাই পাড়াপ্রতিবেশী এখনো তেমন কৌতূহলী নয়।

বাইরে গাড়ির শব্দ হল। মোমবাতিটা পুরোপুরি শেষ হতে আর ইঞ্চিখানেক বাকি। রিনি দাঁতে ঠোঁট কামড়ে চোখ বুজল। বাইরে মিলিটার জোঙ্গার গরগর করছে। ছিটকিনি খুলে দোতলার বারান্দায় গেল রিনি। শরীর আর মনের

গুমোটের ওপর বাইরের হাওয়ার আলতো ছোঁওয়া। জোঙ্গার জলন্ত জোড়া চোখে রাস্তাটা আলোয় আলো। সুকান্ত ছু হাতে গেটটা ধরে নিজের শরীরের ভারটা পা ছাড়াও হাতের ওপর রাখার কসরতে ব্যস্ত। উপর যানে সেকোগে সাব, জোঙ্গা থেকে কে যেন বলল। জরুর, সুকান্তর গলার আওয়াজটা ঘষটে গেল। জোঙ্গার ভেতর থেকে একটা চাপা হাসির গররা উঠেই চুপ। ইস, আর্মির জওয়ানরা পর্যন্ত সুকান্তর অবস্থা দেখে হাসছে। ভাবতেই রিনির মনে হ'ল বাইরের বাতাসেও আগুনের হলকা। জোঙ্গাটা গজরাতে গজরাতে পিছু হটছে ব্যাক গিয়ারে। সুকান্ত হেড লাইটের আলোয় মাখামাখি। তখনো গেট ধরে দাঁড়িয়ে। রিনি নড়ল না। অন্ধকারের মধ্যে আরেক অন্ধকারের চাঙড় হয়ে রইল। টর্চটা ঘরের মধ্যে। সুকান্তকে আলো দেখাবার ইচ্ছেটা রিনির মনে শেকড় গাড়তে পারল না। রিনির মন থেকে এক ঝাঁক ঘৃণার তীর ছুটে গেল একতলায় গেট ধরে দাঁড়িয়ে লোকটির দিকে। জোঙ্গাটা তার আলো আর শব্দ নিয়ে রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে যেতেই অন্ধকার নিজের রাজ্যপাটে ফের হাজির।

সুকান্তর নিজেকে ফিরে পেতে লাগল মিনিট ছুই। কখনো কখনো মনে হয় সময়ের পায়ে ডবল ডাণ্ডাবেড়ি তার পাশাপাশি জীবনের ছ্যাকরা গাড়িমার্কা প্যাসেঞ্জার ট্রেনটাও বেজায়গায় থেমে। গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত পাথরে তৈরি। দিনছুপুরেও ঝিঁঝির ডাক। তখন ফাঁকা মাঠ, খোলা আকাশও জেলখানার পাঁচিল। পরিচিত মুখেও শত্রুর ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতা। একেবারে টোটাল এনসার্কলমেণ্ট। এ চক্রব্যূহ থেকে ব্রেক আউটের কোনো সম্ভাবনা নেই। অফিসের পেজোমিতে বাকি জীবনটা এই মফঃস্বল শহরে শান-বাঁধান অক্ষয় বটবৃক্ষ হয়ে কাটাতে হবে। কলকাতার আড্ডা, বন্ধুবান্ধব, কফি হাউস, প্রেস ক্লাবের স্মৃতি মরচেধরা ব্লেডের টুকরো। বেশি নাড়াচাড়া করলে রক্তাক্ত হবার সম্ভাবনা।

ঠিক তখনই এক একটা দিন ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দেয় সুকান্তকে। নিজেই অবাক হয়ে দেখে পক্ষাঘাতগ্রস্ত মনে ছু-একটা স্নায়ু চিড়িক মারছে। ফিরে আসছে সুখ, ছুঃখ, বিস্ময় সব অনুভূতিগুলোর আলাদা আলাদা স্বাদ। এই সময়টা কিছুক্ষণের জন্যে বেঁচে ওঠে সুকান্ত। যা কিছু করে নি, পারে নি, সেগুলোকে তালুবন্দী করার প্রতিজ্ঞা নেয়। আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জানা থাকে না বলে বাঁকের ওধারের হামলে-পড়া অভিজ্ঞতাটায় এমন তীব্রতা। ধাক্কাটা আচমকা। সেই জন্যেই এই হঠাৎ-পাওয়ার মধ্যে এত রোমাঞ্চ, অম্বাদিত পুলক। নিজের বিপন্ন অস্তিত্বকে বাঁচাবার সেই আঁকুপাকু সময়ে নাগালের মধ্যে যদি চাঙ্গায়নী সুধা

থাকে, তাহলে ডুবি অমৃতপাথারে বলে সুকান্ত বুকভরা দম নিয়ে ডুবসাঁতারু হয়ে যেতে পারে। কে. জে. বলছিলেন, রাজা ট্রায়ামফ্‌ড্‌ ওভার মি ইন হিজ ডেথ। হি কেম আউট অভ্‌ দা ভাইজলাইক গ্রিপ অভ্‌ এনসার্কলমেণ্ট। আমার ওপরেও একটার পর একটা ফাঁস পড়ছে। ড্রাগ এ্যাডিক্ট্‌ টিন এজার সন্‌। পারপেচুয়ালি আনহ্যাপি ওয়াইফ। এত বছরেও আমি অফিসারের জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি। কে. জে. বড় মালটিন্যাশনালের টপ একজিকিউটিভ হলে হয়তো পারত। বিরাট জমিজায়গা, অচার্ড, দেখাশোনার অভাবে পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খাচ্ছে। আর্মিতে থাকলে ব্রিগেডিয়ার হবার সম্ভাবনায় হ্যাঁ এবং না দুটোই সমান জোরাল। একেক বার ইচ্ছে করে প্রিম্যাচিওর রিটায়ারমেণ্ট নিয়ে ফার্মিং করতে। আই থিংক দ্যাটস্‌ দা ওনলি ওয়ে আউট অভ দিস এভার-টাইটনিং এনসার্কলমেণ্ট। নিজেকে একটু একটু করে মেলে ধরছিলেন কে. জে. লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল কানওয়ার জয় সিং, ভি. আর. সি. এ., ভি. এস. এম.। তাঁর ব্যর্থ ইচ্ছার দীর্ঘনিঃশ্বাস একটু একটু করে ঝড় তুলছিল সুকান্তর মনে।

মোমের আলোয় সোফায় হেলান-দেওয়া রিনি মাদাম টুসোর মিউজিয়ামের একটি মূর্তি। সুকান্ত একটু বেশি টগবগে হয়েও কোনো সাড়া আনতে পারল না। ভেতরমুখো, মাঝেসাঝেই ভুরুতে জট, চোখের নজরে ধরাবাঁধা কিছু নেই—এই লোকটিই রিনির কাছে চেনা। আজ রাত্তিরের উচ্ছল, প্রাণবন্ত সুকান্তকে মোটেই অপছন্দ নয় তার। কিন্তু এ মানুষটা মেকি ; দাঁড়িয়ে আছে স্রেফ নেশার কাঁধে হাত রেখে। কথা বললেই ঝাঁঝাল গন্ধ। অসহ্য লাগে রিনির। বাতাস ভরে যায় আলপিনের কুচিতে। সুকান্তর এমনিতে অসুখি মুখে এখন দেবশিশুর হাসি। কোচের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে গুনগুনিয়ে গাইছে : আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না। নেশার ভারে অল্প টালমাটাল গলা। তবু বোঝায় গাইয়ের পেশায় বেমানান হত না। জীবনে সুকান্তর ভুল সিদ্ধান্তের সংখ্যা অনেক। রিনির মনে হয় একটাই মস্ত ভুল করেছে : সুকান্তকে বিয়ে করা।

—দারুণ কাটল সন্ধ্যাটা, হঠাৎ বলল সুকান্ত।

—তোমার সন্ধ্যা হয়তো এখনো শেষ হয়নি, মাদাম টুসোর মিউজিয়ামের মূর্তিটি সবাক হল এতক্ষণে, বলল, আমার কাছে রাত একটা বাজে। ইংরিজি মতে নতুন দিন সুরু হয়ে গেছে। আমার ডিউটি ছিল তোমাকে দরজা খুলে দেওয়া। এখন আমি শুতে যাব। তুমি আজ অন্য ঘরে শোবে।

—আরে, এ রিচুয়ালে তো আমি অভ্যস্ত, সুকান্ত তড়বড়িয়ে বলল, কিন্তু তার আগে আমার একটা পুরো টইটুম্বুর সন্ধের গল্পের বোঝাটা নাবাতে দাও।

রিনি দু হাত পেছনে টান টান করে হাই তুলতে গিয়ে হঠাৎ মুখে হাত চাপা দিল। দুটি স্থির চোখ ছুঁয়ে রইল সুকান্তকে। সে দৃষ্টির মধ্যে কতটা বিতৃষ্ণা, খেয়ালই হল না সুকান্তর।

—হিটলার, লেনিন আর শেকস্‌পিয়ার, সবার জন্মই এপ্রিল তথা বোশেখ মাসে, এঁদের জন্মদিনের ভাগিদার আমি দেখেছি, নিজের মনেই বলে চলল সুকান্ত, তারা জীবনে কেউই কিছু হয়নি। জীবন সমুদ্রে একটা দুটো নিষ্ফল ডুড়ডুড়ি কেটেছে বড় জোর। বরং হিটলারের পার্টনারটির অন্তিম পর্বটি অনেকটা এক ধরনের। দুজনেই আত্মহত্যা করেছিল। হিটলার রাশিয়ানদের এনসার্কলমেণ্ট থেকে ব্রেক আউট করতে পারেনি বলে। আমার বন্ধুটিও অক্টোপাসের শুঁড়ে আস্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছিল। সে শুঁড়গুলোর কোনোটার নাম বেকারি, কোনোটার নাম প্রেমে ব্যর্থতা, কোনোটা আবার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়। আমার দেখা লেনিন চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়ে প্রতিবাদ করেনি, মোজা-গেঞ্জির দোকান দিয়ে বেঁচেবর্তে আছে এক রকম। আর শেকস্‌পিয়ার ইংরিজি সাহিত্যের ধার না ধেরেও আজ একজন মাঝারি গোছের পলিটিকাল মাস্তান। মাঝেসাঝে কাগজে নাম বেরোয় এখনো।

—বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েরাই বাপের নামডাকের ছিটেফোঁটা পায় না তা জন্মদিনের ভাগিদার, রিনি শক্ত গলায় বলল, আর আমাকে রাত দুপুরে এ সব আজেবাজে কথা সাত কাহন করে শোনাবার মানে কী? তুমি একতরফা সলিলকি চালিয়ে তোমার বোঝা হালকা কর। নেশার ঘোর কাটলেই আবার কচ্ছপ হয়ে যাবে। তোমার এই আনন্দসন্ধ্যা তো আর নতুন দেখছি না আজ।

—ওঃ, রিনি, রিনি, নূপুর বেজে যায় রিনিঝিনি, দু হাত আর মাথা এক সঙ্গে ঝাঁকিয়ে বলল সুকান্ত, দিস ইভনিং ইজ টোটালি ডিফারেণ্ট, আজ আমি একটা মস্ত বড় সত্য আবিষ্কার করেছি।

—কেন, নিজের জন্মদিনের ভাগিদারকে পেয়েছ নাকি, আবার হুল ফোটাল রিনি।

—সে তো অনেক আগেই পেয়েছিলাম।

—নতুন শুনলাম। তা কে তিনি? তোমার চেয়ে বিখ্যাত, কুখ্যাত নাকি তোমারই মতন অখ্যাত।

—রাদার শেষেরটা, এ্যান আনওয়েপ্ট এ্যাণ্ড আনসাং হিরো অফ দা সেভেন্টি ওয়ান ওয়ার।

—ভাল কথা, তোমার অফিস থেকে দুবার টেলিফোন এসেছিল।

—ওঃ, লেট দা অফিস গো টু দা হেল, আজ সেই হিরোর জীবনের লাস্ট চ্যাপটারের গ্রাফিক ডিটেলস জানলাম। জীবনের মোদ্দা কথাটা হল ব্রেকিং আউট অফ দা এনসার্কল্‌মেণ্ট। আগেই জানতাম কর্ণেল রাজা সাকসিডেড্ ইন ডুয়িং দ্যাট অলদো এ্যাট দা কস্ট অভ্ হিজ লাইফ। আজ বুঝলাম মৃত্যুও জীবনের চেয়ে অনেক বেশি অর্থবহ হতে পারে। কর্ণেল রাজার কবর, দ্যাট আনমার্কড মাউণ্ড অভ আর্থ, আমি দেখেছি। আমার কাছে সে কবর এখন এপিটাফ অভ ইটারনাল লাইফ, মস্ত বড় সোর্স অভ ইনস্‌পিরেশান। আমাকেও এই ভিশিয়াস এনসার্কল্‌মেণ্ট ভেঙে বেরোতে হবে। সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

—তোমার এনসার্কল্‌মেণ্ট বলতে তো আমি, প্রায় নিভু নিভু মোমের আলোয় রিনির মুখের হাসিটা গোল্লা-পাকান সজারু।

—ওঃ, আবার মাথা ঝাঁকাল সুকান্ত, তোমার তো ফিলসফিতে অনার্স ছিল। জীবনের আরেকটু ভেতরে যেতে পার না? আমাদের সব চেয়ে বড় বাধা তো আমরা নিজেই। ভুলের পর ভুল দিয়ে নিজের চারি দিকে পাঁচিল তৈরি করি। সেই নিজের বানানো জেলখানাকেই ঘরবাড়ি ভেবে ওরই মধ্যে হেসেকেঁদে, ঝগড়া-আদর করে এক রকম করে জীবনটা কাটিয়ে দিই। আসলে আমরা যে নিজেদের তৈরি জালে আটকা পড়ে আছি, এটা বুঝতেই পারি না। আমি বুঝি, তাই আমার এত কষ্ট।

—তোমার কষ্ট তো দুঃখবিলাস, জীবনেও দূর হবে না।

—হায় নারী, তুমিও তো নিজের জালে বন্দী, তোমাকেও এ জাল কেটে বেরোতে হবে। এ লড়াই যার যার নিজের লড়াই। আরেক বার দাড়িওয়ালা বুড়োর নামে কসম খেয়ে বলো—আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।

—মোমবাতিটা খাবি খাচ্ছে, আমি টর্চটা নিয়ে শুতে চললাম। তুমি একা অন্ধকারে বুকের মধ্যে বিশ্বলোকের সাড়ার অপেক্ষায় বসে থাক। রিনি উঠে এসে তুলে নিল টর্চটা।

অমনি মোমবাতিটা নিভে গেল। বাইরের অন্ধকার হুড়মুড়িয়ে ঘরের মধ্যে।

পলতের ওপর এক রত্তি লাল বিন্দু শুধু প্রতিবাদ জানাতে টিঁকে রইল কয়েক লহমা।

কখন ফেব্রুয়ারি আলো ঘরের টিউব লাইটটাকে চাঙ্গা করে তুলেছে কে জানে। পাখার ব্লেডে ঘুরণচাকির ভর। সুকান্তর মাথার মধ্যে বাড়তি ওজন। উঠে গিয়ে উড়ে পড়ার ইচ্ছের সঙ্গে গা-গতর তোলার চেষ্টার বনাবনি হল না। অগত্যা কোচের খোঁদলে আটক। পাশে বইয়ের র‍্যাক থেকে একটা বই টেনে নিল। অনিচ্ছুক চোখ মলাটের ওপরের লেখাগুলো পড়ল—উইলিয়াম সারোয়ানের আত্মজীবনী, হিয়ার কামস, দেয়ার গোজ, ইউ নো হু। ভারি মজার নাম। সারাটা জীবনেই তো নানান লোকের প্রবেশ আর প্রস্থান। কজন আর মনের মধ্যে পাকাপাকিভাবে থেকে যায়। পড়া বই। চোখের সামনে থেকে অক্ষরগুলো পিছলে যাচ্ছে। বইয়ের মধ্যে নানান বয়েসের ছবি সারোয়ানের। যৌবনে সারোয়ান বোধহয় রুভলফ্ ভ্যালেনটিনোর পাশেও বেমানান হতেন না। মাঝ বয়েসে একেবারে অন্য চেহারা। প্রায় বিদ্যাসাগরের মতো কপাল। নাকের নীচে হাফ আশু মুখুজ্জে গোঁফ। সব মিলিয়ে ভীষণ চেনা-চেনা। এর প্রায় যমজ ভাইকে কোথায় যেন দেখেছে সুকান্ত।

—গুড মরণিং সার, সুকান্ত চমকে তাকিয়ে দেখে সারোয়ান সশরীরে দাঁড়িয়ে। বেশ লম্বা মজবুত চেহারা। একটু জলে-যাওয়া ফরসা রঙ। সেই চওড়া কপাল, কপাল, গোটা গোঁফ। বাড়তির মধ্যে দুচোখে হাসির ঝিলিক। বইটা পড়ে গেল হাত থেকে।

—গুড মরনিং মিঃ সারোয়ান, থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল সুকান্ত। যা দেখছে তা যুক্তির ফাঁদে আটকান যায় না।

—বাট মাই নেম ইজ নট সারোয়ান, চওড়া কপাল, মোটা গোঁফ লোকটি দুহাত নেড়ে নিজের অস্তিত্বটা বোঝালেন, বললেন, আয়্যাম লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল সুলতান আহমেদ রাজা, সি. ও. থার্টি সেকেণ্ড বালুচ, পাকিস্তান আর্মি।

—নাউ আই গেট ইউ, প্লিজ বি সিটেড, বসতে বসতে বলল সুকান্ত। কর্ণেল রাজা বসলেন।

—কিন্তু আপনি এখন কোথা থেকে আসছেন, ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের প্রশ্ন করল সুকান্ত।

—হোয়াই, ফ্রম ভালহাল্লা অভ কোর্স, হোয়্যার অল সোলজারস্ হু ফেল ইন

ব্যাটল্ গো।

—তাও তো বটে, আজই সন্ধেবেলায় কর্ণেল কে. জে. বলছিলেন আপনার ভালহাল্লা থেকে আসার কথা।

—ডিয়ার ওল্ড কে. জে. আমি জানি আমাকে কবর দেবার সময় ওর মনের মধ্যে কী রকম তোলপাড় চলছিল। ওর মতো হার্ডনভ, টাফ প্রফেশানাল সোলজার। সবাইকে লুকিয়ে দুবার হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়েছে। বাট আই নো হাউ ডিফিকাল্ট ইট ওয়াজ ফর হিম টু কনসিল হিজ ইমোশানস্ বাহাইণ্ড দা সারফেস অফ হিজ স্টোনি ফেস। আমাকে যে চিনতে পেরেছিল তাও বুঝতে দেয় নি কাউকে।

—আপনি সব জানেন ?

—জানি। ওর সঙ্গেও হয়তো একদিন দেখা হবে ভালহাল্লায়। আমি তো চেয়েছিলামই ওকে সঙ্গে নিতে। কিন্তু যে গুলিগুলো ছোঁড়া হয়েছিল তাতে ওর নাম লেখা ছিল না। সারা শরীরে ক্ষতের মেডেল না আঁটলে তো যাওয়া যায় না। অবশ্য সামনে হওয়া চাই, পিঠে নয়। পড়েছেন তো স্টিফেন ক্রেনের রেড ব্যাজ অভ্ কারেজ।

—তার মানে আপনি—বলতে গিয়ে থমকে গেল সুকান্ত।

—হ্যাঁ, সর্বাঙ্গেই আমাকে রেড ব্যাজ পরতে হয়েছিল, যেন খুব একটা মজার ব্যাপার বলছেন কর্ণেল রাজা এমনি ভাবে বলে চললেন, ফার্স্ট আই স্টপড্ আ বুলেট উইথ মাই লেফট শোলডার। তারপর পেটটা বেয়নেটে এ ফোঁড় ও ফোঁড়। মাই ইনার্ডস্ ওয়্যার হ্যাংগিং আউট। আমার প্রতিপক্ষ গোর্খারা। তাই ভোজালির কোপও পড়ল। তবু কিন্তু আমি ডান হাতে ধরা রিভলভারটার পুরো চেম্বারটা খালি করে দিয়েছিলাম। আই ফাইনালি ফেল হোয়েন মাই চেস্ট ওয়াজ নিটলি স্টিচড্ বাই আ বার্স্ট অভ স্টেন গান বুলেটস্। আমাকে মারতে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল।

প্রত্যেকটি আঘাতের বর্ণনার সঙ্গে সুকান্তর সেই অঙ্গটি শিরশির করে উঠছিল। ভাবছিল যুদ্ধ ব্যাপারটা কতখানি জোরাল এ্যানাস্থেটিক।

—ইউ ফট্ ভেলিয়েন্টলি, যাদের সঙ্গে লড়েছিলেন তারাও সে কথা স্বীকার করেছে, সুকান্ত ভয় আর সম্ভ্রম মিশিয়ে বলল।

—ফিডল্‌স্টিকস্, কর্ণেল রাজার ডান হাতের উলটো পিঠটা লাফিয়ে উঠে সুকান্তর কথাগুলো উড়িয়ে দিল। তেমনি মাছিতাড়ানোর মতো করে বললেন,

মাই পজিশান ওয়াজ টোটালি হোপলেশ। যে কোনো রেসপনসিবল্ অফিসার ও রকম অবস্থায় পড়লে অনর্থক রক্তক্ষয় না করে সারেণ্ডার করতেন। আমিও প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলাম সারেণ্ডার করব। বাট দ্যাট ব্লেবোড্ ব্যাটল্ স্কারড্ সুবেদার মেজর অভ মাই ব্যাটালিয়ন আপসেট এভরিথিং।

—কেন, সুবেদার মেজর আবার কী করল, আপনি আবার বেশি বিনয় দেখাচ্ছেন না তো ?

—মোটেই না, সুবেদার মেজরটি ফোর্থ জেনারেশান সোলজার এবং গোঁড়া মুসলমান। তার ঠাকুরদা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে ফ্রান্সে মিলিটারি ক্রশ পেয়েছিল। সে বলল সারেণ্ডার করা চলবে না। মাই সোলজার্স ওয়্যার ডীপলি রিলিজিয়াস সিম্পল্ ট্রাইবালস্। মাই সুবেদার মেজর সেড্ ইট ওয়াজ আ হোলি ওয়ার, আ জিহাদ, এ্যাণ্ড একসহরটেড্ মাই মেন টু বি গাজীজ। আমার সৈন্যরা যদি ধর্মযুদ্ধে জীবন বিসর্জন দিয়ে গাজী হয়ে বেহেস্তে যেতে চায়, তাহলে আমি আর বাদ সেধে কাপুরুষ বদনাম কুড়োই কেন। সো আই ওয়েন্ট অল দা ওয়ে উইথ দেম।

কর্ণেল রাজার কথাগুলো সুকান্তর মনে গাঁথা হয়ে যাচ্ছিল। বলার ভঙ্গিতে নাটক তৈরির চেষ্টা নেই। এই কথাগুলোই বলেছিলেন কে. জে.। তাতে হাই ভোল্টেজ টেনশান ছিল।

—সব চেয়ে প্যারাডক্সিকাল ব্যাপার কী জানেন, একটা ছোট্ট হাসিতে নিজেকে ঝাঁকিয়ে নিয়ে বললেন কর্ণেল রাজা, দা ডেথ্ উইশ্ অভ দ্যাট গ্রেট সুবেদার মেজর রিমেনড্ আনফুলফিলড্। লোকটা কিন্তু আজো বেঁচে আছে, লিভিং দা লাইফ অভ আ রেচেড ক্রিপল। গাজী হওয়া আর হল না; দা পুওর চ্যাপ ওয়াজ সিভিয়ারলি উনডেড্ ইন দা লাস্ট ডেসপারেট ব্যাটল্। অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। ইওর বয়েজ টুক হিম এ্যাজ আ প্রিজনার অভ্ ওয়ার।

—এ সব মারামারি কাটাকাটির কথা শুনতে আর ভাল লাগছে না। এবারে আপনার নিজের কথা কিছু বলুন, অন্য দিকে কথার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করল সুকান্ত।

—কী আর বলব নিজের কথা, কর্ণেল রাজার হাসিটা পরতে পরতে মিলিয়ে এল। একটা ভারি গম্ভীর গলা কথাগুলো বিষণ্ণতায় ভিজিয়ে ছেড়ে দিল, আই ওয়ান্টেড্ টু বি এ্যান আর্টিস্ট এ্যাণ্ড এণ্ডেড আপ এ্যাজ আ সোলজার। সাচ ইজ দা কোয়ার্ক অভ ফেট।

—গোড়া থেকে বলুন।

—শুনুন তাহলে। শোনার অবশ্য খুব একটা কিছু নেই। আমার জীবনের প্রথম সতেরো বছর কেটেছে ভারতবর্ষে, বাকিটা পাকিস্তানে।

—কে. জে-র কাছে শুনেছি। তবু আবার শুনব আপনার—

—আমার জন্ম উত্তর প্রদেশের লাখনোতে। বাবা ছিলেন সিভিল সার্জেন। বহু পুরুষ ধরে বাস উত্তর প্রদেশে। আমার পূর্বপুরুষের সঙ্গে লখনোর নবাব ফ্যামিলির আত্মীয়তা ছিল। এক সময় অনেক জমি-জায়গীরের মালিক ছিলাম আমরা।

—তবে পাকিস্তানে গেলেন কেন?

—সবই নসিব, চওড়া কপালে টোকা মেরে বললেন কর্ণেল রাজা, আমার তো এতটুকু ইচ্ছে ছিল না। জ্যাঠা, কাকা, বাবা, সবাই মাইগ্রেট করলেন। আমার মতের আর কে পাত্তা দেয়।

—তাহলে আপনি আর আমি দুজনেই জন্মসূত্রে ভারতবাসী।

—তাই তো হওয়া উচিত—হয়তো থাকতাম এ দেশেই। আমার মায়েরও খুব আপত্তি ছিল মাইগ্রেশানে। বলতেন, আমাদের কত পুরুষ এ দেশেই মাটি নিয়েছে, আমরাই বা বিদেশ-বিভুঁইয়ে মরতে যাব কেন? বাবাও অনেকদিন দোনোমোনো করেছিলেন।

—কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত মাইগ্রেট করলেন।

—হ্যাঁ, জ্যাঠা অল্প পসারের উকিল ছিলেন। পাকিস্তানে গিয়ে পয়সার মুখ দেখে ফুলে ফেঁপে উঠলেন। তাঁর কথায় কাকাও চলে গেলেন। সকলের শেষে গেলাম, নাইনটিন ফর্টি এইটে। কে জে. কেম টু দা স্টেশান টু সি মি অফ। হি ওয়েপট্ লাইক আ চাইল্ড।

—আমি আর আপনি একই বয়েসি, সুকান্ত বলল, আপনি যখন লখনো থাকতেন, তখন আমি অনেকবার গেছি সেখানে। ভারি সুন্দর শহর। আমার কাকার বাড়ি ছিল। মাই কাজিনস্ আর স্টিল দেয়ার।

—কে জানে হয়তো দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে। আপনার বাড়ি কোথায়, কর্ণেল রাজা অনেকখানি আগ্রহ ঢেলে জিজ্ঞাসা করলেন।

—কলকাতা।

—আমি প্রথম কলকাতা যাই নাইনটিন থার্টি সিক্সে, তখন আমার বয়েস বছর সাতেক। আমার দাদামশাই জেলার ছিলেন। সে বছর সম্রাট পঞ্চম জর্জের

সিলভার জুবিলি হয়েছিল সারা ব্রিটিশ এম্পায়ার জুড়ে।

—আমারও মনে আছে, সুকান্তর ভুলে মেরে দেওয়া ছোটবেলাটা সাঁ সাঁ করে উঠে এল, নিজের মনেই বলে চলল, সন্ধেবেলা ডকে জাহাজগুলো আলো দিয়ে সাজিয়েছিল। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমাদের পাড়ার লাহিড়ি দাদু, নিজের ছেলেমেয়ে ছিল না, আসপাশের বাড়ির বাচ্চাদের সেকালের হুডখোলা ট্যাকসি করে নিয়ে গিয়েছিলেন সন্ধেবেলায় আলোর সাজ দেখাতে।

—ইজ দ্যাট শো? হোয়াট আ চেঞ্জ কোইনসিডেনস্! আমার দাদামশাইও সব নাতিনাতনিদের আউটরাম ঘাটে নিয়ে গিয়েছিলেন জাহাজের আলো দেখাতে, কর্ণেল রাজার গলায় একই সঙ্গে বিস্ময় আর উত্তেজনার ছড়োছড়ি।

—আরো অনেক বাচ্চা গিয়েছিল, সুকান্ত নিজের পাঁচ বছর বয়েসের স্মৃতিটাকে প্রাণপণে হাতড়াচ্ছে, বলল, একটা ফুটফুটে ফর্সা সুন্দর দেখতে ছেলে আমাদের মধ্যে এক টিন টফি বিলি করেছিল।

—হোয়াই, দ্যাটস্ মি, মাথার ওপর দুহাত তুলে হই হই করে উঠলেন কর্ণেল রাজা।

—ইজ দ্যাট শো, সুকান্ত একটা বিস্ময়ের বোবা হয়ে ফেটে পড়বে এক্ষুনি।

—হ্যাঁ এবং হ্যাঁ, ওই যে টফি বিলি করার কথা বললেন, দ্যাট গেভ মি দা ক্লিক।

—তাহলে ছোটবেলায় আমাদের দেখা হয়েছিল?

—তাই তো মনে হচ্ছে। দা ওয়ার্ল্ড ইজ আ স্মল প্লেস। কিন্তু আজ তো আপনাকে দেবার মতো আমার কিছু নেই, কর্ণেল রাজার টগবগে গলা দুঃখের ভারে কেমন থিতিয়ে গেল।

—ইউ ক্যান গিভ মি আ লট, সুকান্তর গলা কেঁপে গেল উত্তেজনায়, জে. জে. টোল্ড মি দা ওয়ে ইউ ব্রোক আউট অভ দা এনসার্কলমেন্ট। ইউ ডিড ইট ম্যান, ইউ ডিড ইট, আমি এখনো হাতড়ে বেড়াচ্ছি। আমিও লেখক হতে চেয়েছিলাম, পারি নি। আমিও এনসার্কলড হয়ে আছি। আপনি আমাকে ব্রেক থ্রুর মন্ত্রটা শিখিয়ে দিন। আমি নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাই, প্লিজ লেও মি ইওর হ্যাণ্ডস, সুকান্ত মরিয়া হ'য়ে হাত দুটো বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে।

বোশেখ মাসের ন্যাড়া আকাশে সূর্যের মেজাজ চড়তে বেশি সময় লাগে না। সকালটা ওরই মধ্যে একটু অন্য রকম। পুবদিকে দিগন্ত ঘেঁষে নানান সাইজের

ভাঙা মেঘের টুকরোর ঘেঁষাঘেষি। সূর্যের কাছ থেকে ধারকরা রঙে তাদের সাজগোজের পালা চলল খানিকক্ষণ। মাথার মধ্যে জমজমাট হ্যাং ওভার নিয়ে ভোরে ছাদে পায়চারি করছিল সুকান্ত। রোজকার অভ্যেস। ছাতটায় বল পালাবার ভয় না থাকলে টেনিস খেলা যেত। এমনিতে হাঁটার সময় সুকান্তর নজর একটু নিচের দিকে ঝুঁকে সামনে বরাবর। আজ কিন্তু চোখ ঘুরছিল ওপরে, নিচে, ডাইনে, বাঁয়ে। সব চেয়ে বেশি টানল পুবদিকে মেঘ আর সূর্যের চটবদল রঙের নকশা। আকাশে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গত রাত্তিরটা একটু একটু করে আবছা। কে. জে. রিনি, কর্ণেল রাজা, সব এক সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে জেবড়ে আছে। কখন যেন কিছুটা সময়ের জন্যে ছোটবেলায় ফিরে গিয়েছিল। সেই বয়েসটা এখন বড় নিষ্ঠুর। সেই স্বার্থপর বালকদের মতো, যারা কুলফি মালাই কি ঝাল বাদাম খেতে দেখিয়ে দেখিয়ে। জীবনটা আবার পাঁচ বছর বয়েস থেকে আরম্ভ করা যায় না। বাঁচার মেয়াদ তো মোটামুটি তিন ভাগের দু ভাগ কাবার। ভাবতেই কাল রাতের আবৃত্ত দশমিকের মতে ঘুরপাক খাওয়া একটা কথা ঘ্যাঁচ করে গেঁথে গেল মনের মধ্যে ; একটা প্রতিজ্ঞার চেহারা নিয়ে খাড়া হয়ে উঠল : এই প্রাত্যহিকতার প্রতিরোধ ভেঙে বেরিয়ে আসতেই হবে। রোদ চড়ে যাবার পরেও সুকান্ত টের পেল না। আই মাস্ট ব্রেক আউট অভ দিস এনসার্কল্‌মেণ্ট—কথাটা জপতে জপতে মাইল দুই চক্কর দিয়ে ফেলল।

—তোমার আজ হল কী? ব্রেকফাস্ট করবে কখন? বাবিনকে নিয়ে স্কুল বাস চলে গেল অথচ তোমার পাত্তাই নেই। ম্যারাথন ওয়ার্কিংয়ের মহড়া দিচ্ছ নাকি, রিনি কখন উঠে এসেছে ছাদে সুকান্ত লক্ষ করে নি।

—আজ সকালের আলোটা তোমার জন্যেই তৈরি হয়েছে, সুকান্ত আচমকা বলল রিনিকে।

—মানে, একজন অচেনা মানুষের কাছ থেকে নিয়মছুট কথা শুনে থমকে গেল রিনি।

—মানেটা জানে আমার চোখ। এই মুহূর্তে তোমাকে ভীষণ ভাল লাগছে, সুকান্তর গলায় বারো বছর আগে রিনিকে দেখে মুগ্ধ যুবকের ভর।

—তোমার অজস্র দোষের মধ্যে ফ্লাটারি তো ঠিক পড়ে না, ভুরু কুঁচকে বলল রিনি।

—রিনি, গভীর চোখে তাকিয়ে দু'পা এগিয়ে গেল সুকান্ত, বলল, আমার

চারপাশের পাঁচিলটা পাথরের বদলে পাতলা কাচের বলে মনে হচ্ছে। তার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমাকে। এই কাচের পাঁচিলটাও ভেঙে ফেলব শীগ্‌গির। তার জন্যে অবশ্য ক্ষত-বিক্ষত হতে হবে, তবু।

একসঙ্গে ভয়, বিস্ময়, রোমাঞ্চ, আনন্দ অনেকগুলো অনুভূতির উল্‌টো-পালটা টানে এলোমেলো হয়ে গেল রিনি। মুখের চেহারা থেকে থেকে বদলে যাচ্ছে টানাপোড়েনে। শেষ পযন্ত জিতে গেল হারিয়ে ফিরে পাবার আনন্দ। একই সঙ্গে মুখে হাসি আর চোখে জল নিয়ে কাঁপতে লাগল রিনি। সুকান্ত সেই একই রকম গভীর চোখে তাকিয়েই আছে।

সুন্দর সকাল কচিৎ বাকি দিনটার হদিশ দেয়। ফাঁকা বাড়িতে অনেক কাল পরে দিনের বেলায় সুকান্ত রিনিকে আদরে আদরে দলাইমালাই করল। হাঁফাচ্ছিল দুজনেই। রিনি ঝড়ঝাপটার পর দুচোখ বুজে থাকার আনন্দে বুঁদ। সুকান্ত বলল, ভুলেই গিয়েছিলাম বয়েসটা চুয়াল্লিস হল।

ব্রেকফাস্টের পর রোজই কিছুক্ষণ টেলিফোনটা সুকান্তর সঙ্গী-সাথী। তারপরেই পোর্টেবল্ টাইপরাইটারে ঝড় তোলে। আজ ইচ্ছে করেই রোজকার এই বাঁধা রুটিনটা ভাঙল সুকান্ত। তার বদলে টেবিলে বসল নিউজ-প্রিণ্টের প্যাড আর ডটপেন নিয়ে। নানান ছাঁদে বাঙলায় নিজের নামটা লিখল। তারপর খানিক আঁকুবুকি কেটে কাগজটা ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে চালান। আবার কলম চলল নতুন করে। বড় বড় হরফে ফুটে উঠল : কুরুক্ষেত্র। একটু ভেবে সঙ্গে জুড়ে দিল সুকান্ত—এবং তারপর।

রিনি অবাক হয়ে বলল, ও কী লিখছ তুমি বাংলায়। কুরুক্ষেত্র এবং তারপর? সে আবার কী?

—আমি এখন রেমার্ক কিংবা নর্মান মেলার, সুকান্ত হেসে বলল, অথবা সুকুমার রায়ের ভবদুলালও হতে পারি। লিখতে চাইছি আমাদের অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট নইলে দা নেকেড এ্যাণ্ড দা ডেড্। আসলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে চলচিত্তচঞ্চরী। লিখব ভবদুলালের স্টাইলে। যখন যা মনে আসবে টুকে রাখব।

—ভবদুলালবাবু লেখাটা সুরু করছেন কী দিয়ে।

—উহু, আগে শেষটাকে পাকড়ে ফেলি। সেটাই টাটকা টাটকা মনে আছে বলে লেখা সহজ। শেষটা লেখা হয়ে গেলে সুরুর দিকে না গিয়ে উপায় নেই।

সোজাসুজি আরম্ভ করতে গেলে অনেক ঝামেলা—কী লিখব, কী করে লিখব।

বলতে বলতে টেলিফোনটা জানানি দিল। সুকান্ত চোখদুটো টেলিফোনমুখো করে ইশারায় ধরতে বলল রিনিকে। রিসিভার কানে তুলে হ্যালো বলেই মাউথ পিসে হাতচাপা দিয়ে রিনি বলল, ট্রাংক কল কলকাতা থেকে, বোধহয় তোমার চিফ অভ দা ব্যুরো। কাল রাত্তিরেও তোমার খোঁজ করেছিল।

—শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি, এক চিলতে করুণ হাসি মুখে ফুটিয়ে রিনির হাত থেকে রিসিভারটা নিল সুকান্ত। রিনির অনুমান অভ্রান্ত। অন্যদিকে বারো মাস গলায় শ্লেষ্মা আর মনে খেঁকুরে মেজাজ পোষা সেই লোকটির গলা।

—তোমাকে কাল রাত্তিরে দু' দুবার টেলিফোন করেছিলাম, তুমি বাড়ি ছিলে না।

—নিখিলেশদা, বিনা পারমিশানে স্টেশান লীভ করতে পারি না ঠিকই, কিন্তু অফিসের মর্জি না হলে বাড়ি থেকে পর্যন্ত বেরোতে পারব না, এ অর্ডারটা কবে জারি করা হয়েছে? আমি তো এই নতুন সার্কুলারের কপি পাইনি এখনো, সুকান্তর গলায় একেবারে শিশুর নির্মল বিস্ময়। মনে মনে বলল, টেক দা ফার্স্ট সালভো চাম্, আয়্যাম ব্রেকিং আউট অভ দা এনসার্কল্মেন্ট।

—ডোন্ট বি ইম্পার্টিনেন্ট সুকান্ত। কাজের কথা শোন, আগামীকাল চিফ মিনিস্টারের গাঁওমে ক্যাবিনেট, বালুরঘাটে তুমি চলে যাও। টাকা পাঠাবার সময় নেই, ফিরে এসে বিল করে দিও, সেজন্যে অসুবিধে হবে না।

—কেন, জায়গাটা দার্জিলিং নয় বলে কলকাতা থেকে কেউ যেতে চাইছে না? তাই আমার কথা মনে পড়েছে? আমার সাফ জবাব—আমি পারব না। শরীর ভাল নেই, মেডিকাল সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিচ্ছি। তা ছাড়া মাসের শেষ, হাতে টাকা নেই। আর আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন বালুরঘাটে রেললাইন নেই। সুতরাং বাসে যাবার ঝামেলা আমার পোষাবে না। আর আমি না থাকলেও নিউজ এজেন্সি তো আছেই। তাই ইউস্ করবেন।

—সুকান্ত, প্লীজ এটা ম্যানেজ করে দাও কোনো রকম করে, নইলে ক্যাবিনেট মিটিং আনকাভারড্ থেকে যাবে। এ্যাণ্ড দা সি. এম. উইল আলসো টেক দা নোট অভ দা এ্যাবসেনস্ অভ আওয়ার পেপার। সব কাগজ লোক পাঠাচ্ছে আর আমাদের কেউ থাকবে না, ইট ভাজন্ট লুক ·াইস।

—নিখিলেশদা, আপনি খুব ভাল করে জানেন আমি অফিসের ম্যানেজ মাস্টারদের দলে পড়ি না, খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল সুকান্ত, তাই আমি সব চেয়ে কম

ইনক্রিমেণ্ট পাই, আমার দু দুজন জুনিয়ার আমাকে টপকে এস. আর. হয়ে গেছে। আমার ভাল ভাল একসক্লুসিভ স্টোরি হয় কিল্ড্ হয় নয় তো অনেক সময় বিজ্ঞাপনের ভিড়ের মধ্যে বিনা ক্রেডিট লাইনে বেরোয়।

—তোমাকে বাই-লাইন দেব সুকান্ত, কতকটা মরীয়া হয়ে বললেন চিফ অভ দা ব্যুরো।

চারশো মাইল দূরের লোকটির কানের পর্দাফাটানো হাসি সুকান্ত ঢেলে দিল মাউথ পিসের খোঁদলে। বলল, ফুঃ, আই কেয়ার আ টাপেন্স ফর দা বাই-লাইন। আমি এ অফিসে চোদ্দ বছর চাকরিতে দু-বার বাই-লাইন পেয়েছি। ট্রেনি রিপোর্টার অনির্বাণ কনফার্মড হবার আগেই গঙ্গাসাগরে গিয়ে নিজের নামে ছাপা স্টোরি দেখেছে। ও সব কলকাতার হেভেন বর্নদের জন্যে রিজার্ভ করা থাক্। আমি তো সেকেণ্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে আছি, তাই-ই না হয় থাকব।

—জান নিউজ এডিটার, এডিটার দুজনেই তোমার ওপর খাপ্পা। তুমি এ রকম ফ্লেটাণ্টলি রিফিউজ করলে ব্যাপারটা আরো খারাপ হবে, উলটো দিক থেকে ভয় দেখানোর চেহারা নিয়ে কাউণ্টার বম্বার্ডমেণ্ট সুরু হল।

চালাও পানসি, সুকান্ত তার নন্দমামার প্রিয় লাইনটি মনে মনে আওড়াল। মুখে বলল, হেসটিলি কিছু করার আগে ওই দুই ব্যক্তিকে বলে দেবেন যে আর আপনি তো জানেনই—কলকাতার লিভিং ব্যারিস্টার কৃষ্ণদাস ব্যানার্জী আমার আপন মামা। মামলা শব্দটা ওই দুজনের কাছেই জোঁকের মুখে নুন। অনেক অন্যায় সহ্য করেছি, দিস টাইম আইল হিট ব্যাক।

—তোমার কী হল বল তো সুকান্ত, ওদিকের লোকটি ভেবেড়ে-যাওয়া গলায় বললেন, তুমি কি চাকরি করতে চাও না? তোমার মতো মাইল্ড-ম্যানারড, সফট্ স্পোকন্ ছেলে যে এরকম ওয়ানটন্লি ইনসোলেণ্ট টোনে কথা বলতে পারে, আমি ভাবতেই পারছি না।

—একেবারে মনের কথাটি টেনে বার করেছেন নিখিলেশদা, সুকান্ত এক ঝলক হালকা হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলল, গোপন কথাটি রবে না গোপনে। ঠিকই বলেছেন এই নিত্য অপমানের চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারলে আ'উড হ্যাভ বিন দা হ্যাপিয়েস্ট পার্সন। কিন্তু বেসিকালি সিকিউরিটি—সিকিং ভেতো বাঙালি মধ্যবিত্ত তো, তার ওপর বউ ছেলে আছে, তাই চাকরিটা এখনো পর্যন্ত আঁকড়ে থাকতে হচ্ছে।

—তোমার আজ কী হয়েছে বল তো, অন্য প্রান্ত থেকে নির্ভেজাল বিস্ময়

কথাগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

—আয়্যাম ব্রেকিং আউট অভ দা এনসার্কলমেন্ট, ইউ বেটার ট্রাই টু এমিউলেট মি।

—তার মানে? চিফ অভ দা ব্যুরোর গলাটা আর্তনাদ হয়ে গেল।

—সিকস্ মিনিট্স্ ওভার, ট্রাংক অপারেটারের নৈর্ব্যক্তিক গলা ঢুকে গেল কথার মধ্যে। এইবার লাইন কেটে দেবে।

—তাহলে নিখিলেশদা, গলা চড়িয়ে তাড়াহুড়ো করে বলল সুকান্ত, আমি বালুরঘাট যাচ্ছি না আর মেডিক্যাল সার্টিফিকেটটা আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর নিউজ এডিটারকে বলবেন যে এবারে আমাকে শো কজ করলে নিজে হাইকোর্ট থেকে পাল্টা শো কজ নোটিশ পাবেন।

সুকান্ত ক্রেড্‌লের ওপর রিসিভারটা চেপে ধরে মাথা নিচু করে একটা বগবগিয়ে ওঠা হাসির মাথায় ধুলি চাপাতে ব্যস্ত। রিনি একপেশে সংলাপ শুনেছে। তাতেই সারা শরীরে এতক্ষণ ধরে ঠাণ্ডাগরমের খেলা।

—তোমার আজ কী হয়েছে বলতো, তাজ্জব হয়ে বলল রিনি, তোমার নাম সুকান্ত মুখার্জি না সুকান্ত ভটচাজ।

নতুন করে বেপরোয়া হাসির গররা তুলল সুকান্ত। রিসিভার থেকে হাত তুলে বলল, কেন, আমার কথার মধ্যে শুনছ। বিদ্রোহ আজ, বিদ্রোহ চারিদিকে। একটু থেমে বলল, তা ঠিক নয়, তুমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চে ওয়েভেরার প্রতি পড়েছ? আমি সুনীলের মতন দুঃখি গলায় এতদিন বলেছি, চে, আমার কেবলই দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজ থেকে সেই জোব্বা-পরা বুড়োর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলছি: আর দেরি নয় ধর গো তোরা, হাতে হাতে ধর গো। তুমি টেলিফোনটার প্লাগ খুলে দাও। স্মদার দ্যাট ইনফারনাল ইনস্ট্রুমেণ্ট অভ ডিসট্র্যাকশান। আমি আমার চলচিত্তচঞ্চরী সুরু করি।

বাংলাদেশ সবে জন্মেছে। নাড়িকাটার ঘা এখনো দগদগে। নবজাতকের সর্বাঙ্গে পুঁজরক্ত। মোছামুছির জন্যে তুলোর পাহাড় দরকার। প্রাণটুকু শুধু কোনমতে ধুকধুক করছে। আমি রংপুরে আমাদেরই একটা আর্মার্ড রেজিমেন্টের অতিথি। যেখানে আছি সেটাই আগে ছিল খাকি উর্দিদের টোয়েন্টি নাইনথ্ ক্যাভালরির সদর দপ্তর। সার দেওয়া একতলা ব্যারাক। ফ্ল্যাগ স্টাফের সামনে লাল শাকের চারা বসিয়ে এক সময়ে লেখা হয়েছিল রেজিমেন্টের নাম। প্রায় দু'

ফুট সাইজের ইংরিজি হরফে। গাছগুলো অনেকদিন নিয়মমাফিক ছাঁটা হয় না। গাছের পাতা এলোমেলো বেড়ে ঝুপসি চেহারা নিয়েছে। তবু পড়া যায় আগের দখলদারের নাম: টোয়েন্টি নাইনথ্ ক্যাভালরি। পুরোন জমানার লোহার ঘোড়ার আস্তানায় ডেরা গেড়েছে অন্য কিসিমের লোহার ঘোড়া।

সন্ধেবেলা রেজিমেন্টাল মেসে অফিসারদের সঙ্গে আড্ডা। মেসটা আগেই ছিল। এখন শুধু মালিকানা বদলেছে। সি. ও., টু-আই-সি, অন্য সব স্কোয়াড্রন আর ট্রুপ কম্যাণ্ডাররা সকলেই হাজির। ট্যাংক রেজিমেন্ট হলে কী হয়, সেই হর্স ক্যাভালরির আমলের নামধাম, আদবকায়দা সবই থেকে গেছে। অফিসারদের ড্রেস ইউনিফর্মে এখনো লোহার জালের চেনমেল থাকে। আগেকার বর্মের জানানি! একজন সওয়ার—ইনফ্যান্টিতে যাকে বলে জওয়ান—মাঝে মাঝে আমাদের খালি গেলাসগুলো বদলে দিচ্ছে নতুন করে রাম বা হুইস্কি ঢেলে। ঠিক রাত ন'টার সময় মেস দফাদার সি. ও.-র সামনে এসে স্যালুট করে বলবে, খানা তৈয়ার সাব। গেলাসের তলানিটুকু ফুরোতে আরো কয়েক মিনিট। তারপর ডিনার।

লড়াই বন্ধ হয়েছে দিন কয়েক আগে। তবু বেনিয়মে রোজই লোক মরছে, জখম হচ্ছে। গরু-ছাগলও বাদ যাচ্ছে না। ঘাসের সঙ্গে মিলিয়ে আছে মাটির নীচে ঘাপটি মেরে থাকা মাইনের শুঁড়। পা পড়লেই নিদেনপক্ষে বাকি জীবনের জন্যে খোঁড়া। সেদিন সকালেই আমার হোস্ট রেজিমেন্টের একজন সওয়ার বিনা লড়াইয়ে ঘায়েল। জোয়ান মর্দ একটা লোককে বাকি জীবন দেড়খানা পায়ে চলতে হবে, ক্রাচে ভর দিয়ে।

সন্ধেবেলা অফিসারস মেসে খানিকক্ষণ এই ঘটনাটা নিয়ে নাড়াচাড়া। এ্যান্টি পার্শোনেল মাইন। ছ পাউণ্ডের বেশি চাপ পড়লেই নিজের কাজ করবে। সওয়ারটির কপাল মন্দ। তাই বেশি বছর বয়েসেই এক লহমায় বাঁ পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত হাড় আর মাংস পেষাই হয়ে ছাতু। একজন অফিসার বললেন, এর জের চলবে সামনের অনেকগুলো বছর ধরে। আমাদের মাইন ডিসপোজাল ইউনিটগুলো রোজ গাদা গাদা মাইন তুলছে আর ডিভিউজ করছে। কিন্তু সব জায়গায় তাদের নজর পৌঁছন সম্ভব নয়।

ঘুরেফিরে কদিন আগের লড়াই আবার সকলের কথার কমন টপিক। একজন অফিসার বললেন, সব জায়গাতেই কিন্তু পাকিস্তানি আর্মি লেজ তুলে পালায়নি।

—দে আর অলসো বেশিকালি গুড্ সোলজারস্, বাট লেড্ পুওরলি বাই

দেয়ার অফিসারস, বললেন এক ছোকরা ক্যাপটেন।

—কিন্তু সব সময়ে তা হয় নি, কথার মধ্যে ঢুকে গেলেন এক মাঝবয়েসী মেজর, বললেন, মনে আছে সেই থার্টি সেকেণ্ড বালুচের সি. ও.-র কথা। হি গেভ আস আ হেল অভ আ টাইম।

কোরের চিফ অভ স্টাফের হাতে একজোড়া খাকি এপলেট, পে বুকে পাশপোর্ট সাইজের ছবি, চওড়া কপাল, মোটা গোঁফ, চোখের কোণায় আলগা হাসি, আমারই সঙ্গে একই বছরে একই দিনে যার জন্ম; মনের মধ্যে পট পট করে কটা সুইচ অন্ হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম, ইউ মিন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল সুলতান আহমেদ রাজা?

—আপনি নামটা জানলেন কী করে, সি. ও. তাকালেন আমার দিকে। বললাম কোর কম্যাণ্ডারের প্রেস ব্রিফিংয়ের কথা। শুধু কর্ণেল রাজা আর আমার মধ্যে জন্মতুতো আত্মীয়তাটা নিজের কাছেই গচ্ছিত রইল।

—আই সি, ঘাড় নাড়লেন কম্যাণ্ডিং অফিসার।

—আচ্ছা সেই লড়াইটা কোথায় হয়েছিল, আমার জন্মদিনের ভাগিদারটি পেয়ে বসেছে আমাকে।

—এখান থেকে বেশি দূর নয়, বললেন সি. ও., সে এ্যাবাউট থার্টি কিলো-মিটারস্। হি ওয়াজ বেরিড হোয়্যার হি ফেল ইন দা ব্যাটল্।

—একবার যাওয়া যায় সে জায়গাটাতে?

—আর ইউ ইণ্টারেসটেড্, সি. ও.-র ভুরু কুঁচকে গেল।

—ভেরি মাচ, অবশ্য আপনাদের যদি কোন অসুবিধে না হয়।

—না প্রবলেম, একজন সর্দারজী মেজরের দিকে তাকিয়ে বললেন, সান্ধু, ইউ পারহাপস নো দা প্লেস। ইউ ওয়্যার প্রেজেন্ট এ্যাট দা টাইম অভ হিজ বেরিয়াল।

—আই রিমেমবার দা প্লেস সার, বললেন মেজর সান্ধু।

—দেন টেক রিপোর্টার সাব টু দ্যাট প্লেস টুমরো মর্ণিং, সব কিছু পাকাপাকি করে দিলেন সি. ও.।

আর্মির জোঙ্গা গাড়িগুলো জিপের চেয়ে ঢের ভাল। তিনজন ভারিসারি লোক সামনের সিটে বসলে খুব একটা গা ঘেঁষাঘেষি করতে হয় না। আমার এই কনডাকটেড্ ট্যুরের গাইড মেজর সান্ধু। আমি মনটা ফাঁকা করে ফেলতে

চাইছিলাম।

রাস্তার দুধারে খোলা মাঠ। মাঝে মাঝে পাকা ধানের ক্ষেত চিরে ট্যাংকে ঢুকে পড়ার হঠাৎ-গজান রাস্তা। মাটির ওপর একটু তফাতে দু-সার একটানা কামড়ের দাগ। তার মধ্যে পরিপাটি উলের প্যাটার্ণ। বাতাসে ঠাণ্ডার ছোঁওয়াচ। আগুনে পোড়া দেওয়ালে নতুন করে মাটির লেপ। তার ওপর সদ্যকাটা বাঁশ আর টাটকা খড়ের চাল। জোঙ্গার হর্ণে রাস্তা থেকে ঝটপট করে সরে যাচ্ছে হাঁস-মুর্গি। আমাদের গাড়ি দেখলেই গ্রামের বাচ্চারা চেঁচাচ্ছে, জয় বাংলা।

হঠাৎ মেজর সান্ধু হাত তুললেন। থমকে দাঁড়াল জোঙ্গা। আমি তাকাতেই চোখের ইশারায় মেজর সান্ধু আমার নজর ফেরালেন ড্রাইভারকে ডিঙিয়ে বাইরের দিকে। একটা ট্যাংক মুখ থুবড়ে; দুজনেই গাড়ি থেকে নেবে সেই বাতিল লোহালক্কড়ের পাহাড়ের কাছে। মানুষমারা কল মানুষেরই কাছে মার খেয়ে হাড়গোড় ভাঙা দ হয়ে পড়ে। টারেটশুদ্ধু কামানের নলটা পাশ বরাবর ঝুঁকে কুর্নিশ করছে মাটিকে।

মেজর সান্ধুর জবানিতে জানলাম: এই খ্যাতলান স্টিলের দৈত্যটা জাঁতাকলে আটকে-পড়া সেই খাকি উর্দিদের পালাবার রাস্তা করতে এসেছিল। এটা তৈরি হয়েছিল আমেরিকার এক কারখানায় শের্মান নামের তকমা এঁটে। মেজর সান্ধুর রেজিমেণ্টের লোহার ঘোড়াগুলো রাশিয়ায় বানানো পি. টি. সেভেন্টি সিকস্। সেভেন্টি এইট মিলিমিটার কামানের জন্যে ছিল নতুন ধরণের আর্মার পিয়ার্সিং গেল। তার ঘুঁষিতে তিন হাজার ডিগ্রি টেমপারেচার! ওই উত্তাপে সবচেয়ে মজবুত ইস্পাতও গলে মাখন। তাই শের্মান ট্যাংকটার ওই হাল। দু-তিনটে সঙ্গীসাথী ছিল। তারা ওই নতুন শেলের টার্গেট হতে রাজি হয় নি। পালিয়ে বেঁচেছে।

—সারা রাত ধরে জলেছিল ট্যাংকটা, মেজর সান্ধু বলছিলেন খোসমেজাজে, ইট প্রোভাইডেড আস উইথ স্পেলডিড্ ফায়ারওয়ার্কস্ হোয়েন ইটস এ্যামুনিশান স্টার্টেড্ একস্প্লোডিং। জলন্ত ফারনেসের মধ্যে আটক ট্যাংকের ক্রু একজনও পালাতে পারেনি। অল অভ দেম ওয়্যার রোস্টেড্ এ্যালাইভ।

কান দিয়ে কথাগুলো ঢুকছিল ঠিকই। কিন্তু তাদের জেঁকে বসতে দিতে মন নারাজ। তিন তিনটে লোক এই ট্যাংকটার মধ্যে পুড়ে কয়লা। লোহার ঝলসান কফিনটা এখানে কতকাল পড়ে থাকবে কে জানে।

অবশ্য আমাদের তরফেও এরকম ঘটতে পারত, আমাকে চুপচাপ দেখেই বোধ

হয় বললেন মেজর সান্ধু, ওয়ার ইজ আ ক্রুয়েল গেম, লাক প্লেজ আ লট ইন ইট।

কথাবার্তা—যা এতক্ষণ একতরফাই ছিল—আপনা থেকেই বন্ধ। চলে এলেই হয়। তবু দাঁড়িয়ে। তিন-চারটে লুঙ্গিপরা খালি গা ছেলে এক পা দুপা করে আমাদের দিকে। ওদের মধ্যে একজন ডাক দিল, আব্বাস।

অমনি ট্যাংকের হাঁ-করা হাচের ভেতর থেকে একটা ছোট্ট মাথার উঁকি। একজোড়া বড় বড় চোখ আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে। গুমোট কেটে গেল। অকেজো ট্যাংকটা বাচ্চাদের খেলার জায়গা হিসেবে একটা সার্থকতা পেয়েছে। মেজর সান্ধুর মুখেও হাসি।

ছেলেটা তড়বড়িয়ে নাবল ট্যাংকের গা বেয়ে। বয়েস বড় জোর বছর দশেক। ছেঁড়া ময়লা শার্টস আর গেঞ্জি পরা। জয় বাংলা বলে চেঁচিয়ে সঙ্গীদের দলে ভিড়ল। ততক্ষণে সব বাচ্চাগুলোই জয় বাংলা শ্লোগানটা গলায় তুলে নিয়েছে।

আবার চলল আমাদের জোঙ্গা। সরু ফিতের মত রাস্তা। খরচ বাঁচাবার জন্যে দেশের সাকেব মালিকরা শুধু দুটো ধারই পিচ দিয়ে বাঁধিয়েছিল! মাঝখানটা ইটের। ওখানকার লোকে বলে পায়জামা রাস্তা। অথচ এটাই নাকি আবার হাইওয়ে।

খানিক যাবার পর মেজর সান্ধু ড্রাইভারকে বললেন, ধীরসে চলো। দুচোখ সার্চ লাইট হয়ে এদিক ওদিক দেখছে। আস্তে আস্তে চলছে গাড়ি। হঠাৎ মেজর সান্ধু চললেন, রোখো।

থামল গাড়ি। নাবলাম দুজনে। চারিদিক সুনসান। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সোয়েটারটা ফুটছে গায়ে। রাস্তা থেকে মাঠে নাবলেন মেজর সান্ধু। তাঁর পেছনে আমিও। এবড়ো-খেবড়ো জমি। বিশ-পঁচিশ গজ গিয়েই একটা সামান্য উঁচু ঢিপি। পাশেই একটা গাছ ফাঁকা মাঠ পাহারা দিচ্ছে।

—দিস ইজ দা গ্রেভ অফ কর্ণেল রাজা, ঢিপিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন মেজর সান্ধু।

কোথা থেকে সুরু, কোথায় শেষ। সেই চওড়া কপাল, মোটা গোঁফ, দু'চোখে নির্দোষ হাসি, একেবারে আমার সমবয়েসি মানুষটি এই ঢিপির নীচে শুয়ে।

মেজর সান্ধু বলছিলেন এক রাত্তিরে চার চার বার কাউন্টার এ্যাটাক করেছিল থার্টি সেকেণ্ড বালুচ। প্রতিটি এ্যাটাকের পরেই খাকি উর্দিদের লড়িয়ে লোকের সংখ্যা কমতির দিকে। চারিদিকে শক্ত ফাঁস। একধারে গোর্খারা। অন্য দিকগুলো আগলে ছিল গার্ডস্ আর ম্যাড্রাস রেজিমেন্টের কটা কম্পানি। তাদের পেছনে

মেজর সান্ধুর আর্মড রেজিমেন্টের দুটো ট্রুপ মানে আটটা ট্যাংক। যে কজন শেষ পর্যন্ত লড়বার মত অবস্থায় ছিল তাদের কুড়িয়ে বাড়িয়ে মরীয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করেছিল বালুচরা। এবারে সকলের আগে কর্ণেল রাজা নিজে। রুখে দাঁড়াল গোর্খারা। শেষগুলির শব্দটা যখন মিলিয়ে গেল, তখন ভোরের আলো ফুটিফুটি। এখানেই পড়ে ছিল অলিভ গ্রীন আর খাকি উর্দি পরা কয়েকজন। সকলেরই জীবনের লাস্ট স্টপ। তার মধ্যে একজন কর্ণেল রাজা। সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত ব্যাটম্যানটি। শেষ পর্যন্ত সে তার কর্ণেল সাবের সঙ্গে থেকেছে।

—হি ওয়াজ ভেরি ব্রেভ, বললেন মেজর সান্ধু। কোন ঘৃণার ছাপ নেই গলায়। ভাল খেললে হেরো টিমের ক্যাপটেনকেও সাবাস জানায় ঘাম ঝরিয়ে জিতেছে যারা।

—লেটস্ গো, বললেন মেজর সান্ধু।

এই ন্যাড়া কবরে সদ্য গজান ঘাসগুলোই এপিটাফ। ওদেরই মধ্যে থেমে-না-থাকা জীবনের উঁকিঝুঁকি। আবার আমরা রাস্তার দিকে! আরেকবার তাকালাম পেছনে। সামান্য একটা ঢিপি বই নয়। এক বর্ষার জলেই গলে মাটির সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে। থাকবে শুধু পাশের নিঃশব্দ গাছটা।

রবীন্দ্রনাট্যচর্চায় অন্তর্মুখ

তপন সরকার

বহুরূপীকে বলা হয় রবীন্দ্রনাট্য পরীক্ষণের পথিকৃৎ। শম্ভু মিত্র একসময় একের পর এক অসামান্য রবীন্দ্রনাট্য মঞ্চায়নের মধ্যে দিয়ে আমাদের শিখেয়েছিলেন দুরূহ তত্ত্বজালই রবীন্দ্রনাট্যের একমাত্র অবলম্বন নয়, তার মঞ্চোপযোগিতা ও প্রসাদগুণ অবিমিশ্রিত। কিন্তু বেশ কিছুকাল বহুরূপী নতুন কোনো রবীন্দ্রনাথের নাটকে হাত দেননি। বা, এ দশকে এসে পুরনো নাটকগুলির পুনরাভিনয় দেখিনি। কয়েক বছর আগে চার অধ্যায় করার সময় শ্রীমিত্র বলেছিলেন যে তিনি নতুন করে এ নাটক করতে চান কারণ পঞ্চাশের, ষাটের বা সত্তরের দশকের থেকে আমাদের বাকরীতি, চলন সব কিছু পালটেছে, তাই তিনি চান সমকালের সঙ্গে সমন্বিত করে অভিনয়ের মাধ্যমে নবমাত্রা দান করতে। কিন্তু আমরা যারা দেখেছিলাম, হতাশ হই—পুরনো গঠন থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। আরো পরে তৃপ্তি মিত্র'র বহুরূপী-অনুকরণসর্বস্ব রক্তকরবীও ঠিক সেভাবেই হতাশ করে; একটি নিখুঁত প্রযোজনার চতুর্থ কারবণ কপি হয়ে।

ফলে বহুরূপীর সেই রবিরশ্মি-উজ্জলিত সময়ের পর রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনায় যে ফাঁক থেকে গেছে সেটা বেদনার। অথচ বাংলা নাটক যখন অনুগলিতে মাথা ঠুকে মরছে তখন রবীন্দ্রনাথই নতুন পথ দেখাতে পারতেন, অন্তত খানিকটা।

রবীন্দ্রনাট্যের মতো ধ্রুপদী নাটক করার দুটো মানে থাকতে পারে। হয় তাকে সমকালীন প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, নয় মূল নাটকটি অক্ষুণ্ণ রেখে নাটকের নিজস্ব বক্তব্য ও আঙ্গিকে একটি নিটোল প্রযোজনা মঞ্চস্থ করা।

কিন্তু বহুরূপী ছাড়া প্রায় সকলের প্রযোজনায়ই বহুরূপীর অনুকরণ এবং তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রযোজনার ছবি দেখে পোশাক-মঞ্চ ইত্যাদির হুবহু কপি করার চেষ্টা—তাও না বুঝে। ফলে পাড়ায় পাড়ায় গড়ে ওঠা অসংখ্য দলের সেইসব অসহ্য প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাইনি। সেকারণে রবীন্দ্রনাট্যের দর্শক কমে গেছে, পাড়া-অফিসক্লাব-গ্রুপ থিয়েটার সবাই ঝুঁকেছে মনোজ মিত্রর সরসতার দিকে।

আসলে রবীন্দ্রনাটককে তথা রবীন্দ্রনাথকে আমরা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে আত্তিকরণ করতে পারিনি। তার কারণ স্বচ্ছ জ্ঞানের অভাব বা স্বচ্ছ জ্ঞানের প্রতি আত্মবিশ্বাসের অভাব। রবীন্দ্রনাট্য !! এই শব্দ-ব্রহ্মাণ্ডের গন্দমাদন ভারকে আরো ভারাক্রান্ত করেছে নাট্যদলগুলি এবং দূর থেকে সভয়-প্রযোজনায় হাত ছুঁইয়েছে।

এই সময় এমন কোনো একটি দলের প্রয়োজন ছিল যারা আত্মবিশ্বাসী প্রত্যয়ে নিজেদের বিশ্লেষণটুকুর প্রতি আস্থা রেখে সমালোচনার ভয়কে ধাক্কা দিয়ে প্রযোজনা করতে পারে। এবং যারা রবীন্দ্রনাট্য বিশ্লেষণের একাডেমিক বোবির সঙ্গে থিয়েটারের টেকনিক্যাল বোধ সম্পর্কেও অভিজ্ঞ, পক্ক। রবীন্দ্রনাট্যের চর্চার বদলে চর্যায় পৌঁছে দেবে। অন্তর্মুখের 'বিসর্জন' যখন দেখেছিলাম, চমক্ লেগেছিল। বিসর্জনের মতো একটি বৃক্ষোপম নাটক এঁরা অতি-অহংকারীর মতো সম্পাদিত করেছেন—বাদ গেছে—জনতা দৃশ্য, দেবী মূর্তির মুখ ঘোরানোর দৃশ্য। সংযোজিত হয়েছে ভরতবাক্য 'এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে···'। তবুও প্রযোজনার বুনন ছিল অটুট। নিজেদের বক্তব্যের জায়গার প্রতি ছিলেন বিশ্বস্ত। জিজ্ঞেস করেছিলাম নির্দেশক শুভকুমার বসুকে "কেন সম্পাদনায় এই যথেচ্ছচার?" খুব দৃঢ় জবাব পেয়েছিলাম "রবীন্দ্রনাট্যের পরবর্তীকালে রাজা মুক্তধারা ইত্যাদিতে জনতা যেমন আলাদা একটা অবিচ্ছেদ্য চরিত্র হয়ে ওঠে, বিসর্জনের জনতা সেরকম কোনো অত্যাবশ্যকীয় মাত্রা পায় না। জনতা বাদ দিয়ে শুধু দৃশ্যকাব্যগত একটা পরিপূর্ণতা বিসর্জনে রয়েছে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেও তো ইংরাজি অনুবাদ Sacrifice-এ বাদ দিয়েছিলেন জনতা। আর মূর্তি ঘোরানোর দৃশ্যটা বাদ দিয়েছি কারণ আমার মনে হয়েছে এতে সূক্ষ্ম কোনো বুদ্ধিদৃপ্ত নাট্যক্রিয়া নেই, ব্যাপারটা বেশ বোকা বোকা। আর শেষের ভরতবাক্যে হিংসা আর বলি থেকে উত্তীর্ণ জীবনের কথা পৌঁছে দিতে চেয়েছি 'এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময় দূর করে দাও সর্বকুচ্ছ ভয় লোকভয় রাজ্যভয় মৃত্যুভয়'—এই আবেদন জানিয়ে।" হয়ত সব রবীন্দ্রপাঠক

এইরকম স্বেচ্ছাচার মেনে নিতে নাও পারেন বা বিরোধী বক্তব্য থেকেই যায় কিন্তু তরুণ পরিচালকের এই সাহসী প্রত্যয়কে হাততালি দিতেই হয়। জয়সিংহকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক আবহাওয়া তাকে সমকালীন দুটি ঘটনার সঙ্গে তাই মিলিয়ে নিতে অসুবিধে হয় না।

এঁদের দ্বিতীয় প্রযোজনা 'অমর্ত্য বিভা'র প্রচার পত্রের ভাষা ছিল 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে কিশোরচরিত্র ভাবনার ঐক্যসন্ধানে রক্তকরবী মুক্তধারা শ্যামা, ঘরে বাইরে ও বিসর্জনের নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয়ে একটি গবেষণাধর্মী নাট্যকোলাজ'। এই দীর্ঘ প্রচার ভাষা থেকে সংশয়, ভয় এবং কৌতূহল জমে ওঠে। সেইসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্নও।

কোলাজের চারপাতা দীর্ঘ রচনাটিতে থেকে প্রথমে স্পষ্ট হন এই প্রযোজনার মূল বিষয়টি। রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখা যায় কিশোর চরিত্ররা মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে সত্যবোধ। কখনো এরা আশ্রিত হয় কোনো অগ্রজা নারীর মাতৃত্বের কাছে এবং নারীটিকে পৌঁছে দেয় সত্য, ধর্মের কাছে। তেমনি সেই নারীও কিশোরটিকে এগিয়ে দেয় মৃত্যুর দিকে। এই ঐক্যভাবনার রূপমূর্তি 'অমর্ত্য বিভা।' সেই সঙ্গে রয়েছে, চরিত্রে, ঘটনায় আরও সাদৃশ্য। এই অন্তর্গত ঐক্য, একই চরিত্রের, ঘটনার ঘুরে ফিরে আসা হয়ত সাহিত্যে খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টির বিচারে ধরা পড়ে কিন্তু তাকে মঞ্চে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা কতটা পাগলামী নয় সে প্রশ্ন থাকেই।

অমর্ত্য বিভার সবচেয়ে বলিষ্ঠ জায়গা সম্পাদনা। কেবলমাত্র মূল বক্তব্য অনুসারী দৃশ্যগুলিকে সংগ্রথিত করলে নাটকগুলি না-পড়া দর্শকদের অসুবিধে হত। তাই মোটামুটি একটা গল্পকে রেখেই কিশোরচরিত্র বিশ্লেষণাত্মক জায়গাগুলি রাখা হয়েছে। কিন্তু এর ফলে একটা বড় সমস্যা তৈরি হয়। মূল কাহিনীকে ব্যাহত করা হচ্ছে তাই কাহিনীর মূল শিকড় থেকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষত মুক্তধারার সম্পাদনে এই সমস্যাটা ছিল তীব্র। কেবল অভিজিতের দিক দিয়ে নাটকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে বাদ পড়েছে ধনঞ্জয়, জনতা। ফলে একটা বড় অংশ ধরা পড়ল না নাটকটির। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার জন্য এছাড়া কিছু করার ছিল না। একটি চরিত্র নির্মিত হয়ে ওঠে পুরো নাট্যঘটনা এবং পারিপার্শ্বর দ্বারা, কিন্তু একটি খণ্ডিত অংশ কি সেই চরিত্রকে পুরোপুরি চিত্রিত করতে পারে—অংশ কি সম্পূর্ণের আস্বাদ দিতে সমর্থ? ফলে আমাদের আশ্রিত হতে হয়েছে ভাষ্যপাঠের ওপর।

কিন্তু তবুও ঐক্য নির্মাণ ছিল সঠিক। অভিজিৎ বলছে 'সুন্দর এই পৃথিবী,

এর যা কিছু সুন্দর সমস্তকে আমি নমস্কার জানাই।' জয়সিংহ বলে 'সুন্দর এই পৃথিবী···যাব যাব তাই যাব, ছেড়ে চলে যাব'। অথবা রক্তকরবীর কিশোর বলে নন্দিনীকে 'তোর জন্য প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি'। অমূল্য বলে 'তুমি যা বলবে আমি প্রাণ দিয়ে করব দিদি।'

এরকম অসংখ্য মিল চরিত্রে, ঘটনায়। কিন্তু সেগুলি অন্তর্মুগের শিল্পীরা অত্যন্ত যত্নে আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। এর জন্য মূলত দুটি পদ্ধতি তাঁরা নিয়েছিলেন। প্রথমত এই ঐক্যময় সংলাপগুলো প্রায় একই কম্পোজিশানে বলানো হয়েছে। যেমন অভিজিতের আর্তির সময় অভিজিত সঞ্জয়ের অবস্থান আর জয়সিংহর দ্বন্দ্বের সময় অপর্ণা-জয়সিংহর অবস্থান এক—ইত্যাদি। আর সংলাপ বলার ধরণের ক্ষেত্রেও এঁরা একটা ঐক্য নিয়েছেন। এ ভাবে পরিচালকের টিমওয়ার্ক তৈরির কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে শ্যামার উত্তীয়র মৃত্যুর পেছনে আত্মস্বার্থ এবং সেকারণে পাপবোধের সঙ্গে বিমলার অমূল্যকে বিপদের মুখে ছুঁড়ে দেওয়ার পাপবোধকে সদৃশ মনে হয় বা মিলিয়ে নিতে পারি নন্দিনী কিশোরকে রক্তকরবী দিয়ে পাঠিয়েছিল রঞ্জনের কাছে, সেই কিশোরের মৃত্যু-উৎসারিত নন্দিনীর পাপবোধ তাকে দাঁড় করায় রাজার বিরুদ্ধে। অথবা রণজিৎ, রাজা, রঘুপতি—এঁদের বিচ্ছিন্ন অহং থেকে মুক্তি ঘটে প্রায় এক ভাবেই। কিন্তু একটি নাটকের চরিত্রগুলির সঙ্গে অন্য নাটকের চরিত্রগুলির মিল তো হুবহু নয়, অঙ্কের ফরমুলা নয়, তাই সমস্যা হল প্রযোজনার খাতিরে কি এদের জোর করে মেলানো হচ্ছে না? কিন্তু আমার মনে হয়েছে সে ব্যাপারে পরিকল্পক সতর্ক ছিলেন জোর করে মেলানোর বদলে মিলটুকু ধরিয়ে দিতেই তিনি সচেষ্ট।

এঁদের পূর্ববর্তী নাটক বিসর্জনের সম্পাদনার কেন্দ্রটিও ছিল জয়সিংহর আত্মদ্বন্দ্ব এবং সেই সঙ্গে কতগুলি চেতনার স্তর অতিক্রম করতে করতে একটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের কাছে পৌঁছনো। এই প্রযোজনায়ও দেখলাম এই কিশোররা সারল্য-বিস্ময়-যন্ত্রণাবোধ-মৃত্যু এই পথপরিক্রমণ করছে। তাহলে প্রশ্ন বিসর্জনের পরে এই প্রযোজনা করা কেন? পরিকল্পকের মতে 'একটি ঘটনা, একটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে একটা বিষয় বা বক্তব্যকে যতটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, আমার মতে, তার থেকে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে একগুচ্ছ একই ঘটনা এবং প্রায় একই চরিত্রের সংস্থাপনে। একটি ঘটনাকে Incident বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কিন্তু পাঁচটি ঘটনাকে তো যায় না। যেমন এই নাট্যকোলাজে দর্শক যখন পাঁচ কিশোরকে একই সঙ্গে মরতে দেখে প্রায় একই সমাজনৈতিক আবেষ্টনে, তখন তা

আজকের কিশোরদের এই সমস্যাকে অনেক দৃঢ়তার সঙ্গে মূর্ত করে। তেমনি ভাবেই অন্যান্য চরিত্রদের চারিত্রিক সাদৃশ্যের ফলে দর্শকদের পক্ষে চিনে নিতে সুবিধে এদের।' শুভকুমার বসুর বেশি একই ধরনের চরিত্র দিয়ে বেশি effective করার এই পদ্ধতিকে যদি আমরা মেনে নিই তাহলে বলতে হয় অমর্ত্য বিভা একটি সম্পূর্ণ নতুন নাট্য আঙ্গিক। 'নাথবতী অনাথবতে'র Narative আঙ্গিকের অভিনবত্ব নিয়ে যখন আমরা আন্দোলিত তখন প্রায় অপরিচিত দলের এই রকম একটি নিরীক্ষা আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে।

আলাদা করে ঘরে বাইরে নাট্যরূপাংশটি ভালো লাগে। সন্দীপ-অমূল্য-বিমলার অন্তর্ঘাতকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এবং সময়সীমিত হওয়ায় নিখিলেশ অনুপস্থিত। শুধু একটি দৃশ্যে উপস্থাপিত করা হয় তাকে তাও সংলাপ দেওয়া হয়নি। বিমলার কণ্ঠে 'মাটির বুকের কাছে' গানটির প্রয়োগ এবং গানের শেষে 'তখন মাটি পায়রে পায়রে তাকে'তে নিখিলেশের এগিয়ে আসা ও তাকে জড়িয়ে ধরা এইটুক অনুদৃশ্যে বিমলাকে নিখিলেশের স্বরূপ আবিষ্কার ও প্রত্যাবর্তনটি দৃষ্ট হয়েছে। বিমলার ভূমিকা চিত্রলেখা বসু উইলিয়ম নাট্যরূপটিকে অভিনয়গুণে আরো সার্থক করে তোলেন। দর্শকদের কাছে ক্লান্তিকর হয় না তাঁর দীর্ঘ স্বগত সংলাপ স্বচ্ছন্দ চরিত্রানুগ অভিনয়ের জন্য। অথচ আবেগও কখনো মাত্রা ছাড়ায় না। অমূল্যর ভূমিকায় পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের গলা একই বিরোধিতা করলেও অমূল্যর পবিত্রতা ছিল অটুট।

ভয় ছিল শ্যামা নৃত্যাংশটি সমগ্র অনুষ্ঠানের মধ্যে আলাদা হয়ে ছন্দপতন করবে কিনা কিন্তু অভিনয়কেই ছন্দবদ্ধ নৃত্যরূপ দিয়ে সে ভয় দূর করেছেন পরিচালক অন্য অংশগুলির সঙ্গে পর্দাও ছিল এক সুরে বাঁধা। বিশেষত উত্তীয়র মৃত্যুদৃশ্যে এগিয়ে আসা মানুষের কারাপ্রাচীরের কেরিওগ্রাফি এবং মৃত্যু মুহূর্তে তাদের হাত তুলে দেওয়া এক গভীরতর সামাজিক নির্দেশের ইঙ্গিত দেয়। নাট্যাংশের আবহ সঙ্গীত শ্যামার সঙ্গীতের তুলনায় ছিল বেশি। মধুমিতা ঘোষালের কণ্ঠে 'হায় একি সমাপন' উচ্চারণ ও সুরের নিখুঁত ঐক্যে স্পর্শ করে যায়। রবীন বসুও সুকণ্ঠের অধিকারী।

রক্তকরবীর অংশটিও সুঅভিনীত। নন্দিনী রাজার সংঘাতে দৃশ্যটি ঘনবদ্ধ হয়ে ওঠে। লাবনি সরকার (নন্দিনী) তার কণ্ঠকে খুব সহজে ওপরে তুলতে পারেন। তুলনায় মুক্তধারা, ছিল কিছুটা ম্লান, ঘটনাপ্রবাহ স্বচ্ছতা পায়নি। বিসর্জনের অংশ নির্বাচন ছিল যুক্তিপূর্ণ। জয়সিংহর প্রায় কুড়ি মিনিট দীর্ঘ

সংলাপ নাট্যদ্বন্দ্বকে চিত্রিত করে। শুভকুমার বসু জয়সিংহর সংলাপে আবেগ ও বোধির সংযত ও সুমিশ্রণের প্রমাণ দিয়েছিলেন। তবে শব্দ তাঁর কণ্ঠে কখনো কখনো ভারী হয়ে উঠছিল। তবে মুক্তধারার সঞ্চয়ে অনাবশ্যক অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব আরোপিত ছিল। অন্যমুখের ছোটখাট চরিত্ররাও মোটামুটি তৈরি। দেবব্রত ঘোষের কিশোর লাবণ্যময়। দেবব্রত দাশের ধ্রুব ও বেহারা স্বচ্ছন্দ। শুভ্র চক্রবর্তীর বটু চরিত্রানুগ। মৃণাল চক্রবর্তীকে আরেকটু দৃঢ় হতে হবে রণজিতের ভূমিকায়। অনমিত্র দাশকে মঞ্চ ব্যবহার বিষয় আরো শিক্ষিত হতে হবে।

মঞ্চ ব্যবহারে সামান্য কয়েকটি পরিবর্তন মূলত একই মঞ্চকে প্রতিটি নাটকে ব্যবহার করার প্রসংশনীয়। বিশেষত ঘরে বাইরের মঞ্চ সজ্জা ছিল শিল্পসম্মত অথচ নাট্যসহযোগী। (মঞ্চ রামপদ চট্টোপাধ্যায়)। আলোর কাজের মধ্যে দরজার ফ্রেম ধরে দাঁড়ানো বিমলার পেছনে আগুন, বিমলার চিত্তশুদ্ধির আগুনকে মনে পড়ায়। আসলে অভিনয়-মঞ্চ-আলো সমস্ত দিককে যেভাবে সমন্বিত করা হয়েছে, বলিষ্ঠ হাতে, তা যে কোনো বড় দলের পক্ষেও ঈর্ষণীয়। আর তাই সমগ্র নাট্যকোলাজের সম্পূর্ণতা ছিল আশাতীত।

পরিশেষে একটাই কথা বলবার আছে, আলোচনায় জানতে পারলাম প্রতিটি অভিনয়ে এদের প্রচুর টাকা নিজেদের পকেট থেকে দিতে হয়, সকলেই প্রায় ছাত্র তাই সরকারী বা আধা সরকারী যে রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তাঁরা কি এই ধরণের গবেষণাধর্মী অনুষ্ঠানকে অর্থসাহায্য দিতে পারেন না? ফুটনোটকণ্টকিত দুরূহ গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশের চেয়ে বোধহয় সেটা অনেক সুব্যয় হবে।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম লিঃ

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩

ক্ষুদ্রশিল্পে রেজিষ্ট্রিকৃত উৎপাদনকারী সংস্থাসমূহ অতি সহজেই পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগমের মাধ্যমে নিজ কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। বিশেষতঃ কাঠ ও লৌহজাত আসবাবপত্র, ইনভারটার, ফ্যান, প্লাষ্টিক ও এলুমিনিয়ম ইউটেনসিলস্, টিউবওয়েল হ্যাণ্ডপাম্প, ম্যানহোলকভার, ফিসিংহুকস, জি. আই বাকেট প্রভৃতির প্রস্তুতকারী ইউনিট সমূহকে অবিলম্বে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

মার্কেটিং ম্যানেজার

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম

শিল্পভবন, ২ ও ৩ নং ব্লাকবার্ণ লেন

(তৃতীয়তল) টেরিটিবাজার, কলিকাতা-১২

BIVAV

Price : Rs. 5.00 | April-June 85 | Regd. No.
Vol. 8. No. 3 | Published in August | R. N. 30017/76

DURGAPUR CHEMICALS LIMITED

(A Government of West Bengal Undertaking)

With best compliments from :

DURGAPUR CHEMICALS LIMITED

Head Office :

6, Little Russell Street, Calcutta-700 071

Cable : DURGACHEM, CALCUTTA. Phone : 44-4391 (3 Lines)

Factory :

Durgapur-713215 Dist : Burdwan

Cable : DURGACHEM, DURGAPUR. Ph. : 5394-5498 (5 Lines)